বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

তৃতীয় ভাগ

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধিকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস
অনুযায়ী সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক

Notification No. Syl/6/54 dt. 8.3.54 ; Calcutta Gazette, 25th. March '54

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

তৃতীয় ভাগ

(সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য)

প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

ও

কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

উমাপতি বাজপেয়ী

ও

অজিত মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

প্রোগ্রেশিভ্ থিঙ্কারস্ লাইব্রেরী
৬২।৬, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

তৃতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

বায়ু ও উহার উপাদান

আমাদের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একটি গ্যাসীয় আবরণ আছে, ইহাকেই বায়ুমণ্ডল বলা হয়। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর একটা আচ্ছাদন-বিশেষ এবং পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর সহিত লাগিয়া আছে। প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক ও ঋষিগণ এবং পুরাকালের গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুকে একটি মৌলিক পদার্থ মনে করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ফরাসী বৈজ্ঞানিক **লাভয়সিয়ে** (Lavoisier) কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, বায়ুর অন্ততঃ দুইটি উপাদান আছে—একটি **অম্লজান** (Oxygen) ও অপরটি **সোরাজান** (Nitrogen)। বায়ুতে অম্লজান অপেক্ষা সোরাজানের পরিমাণ অধিক। অম্লজানের সাহায্যে দহন ও শ্বাসক্রিয়া চলে। সোরাজানের সেরূপ ধর্ম্ম নাই। অম্লজান বায়ুর সক্রিয় অংশ এবং ইহার প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি সোরাজান কর্ত্তৃক সংহত হইয়া থাকে। বায়ুর উপাদান মুখ্যতঃ অম্লজান ও সোরাজান হইলেও উহাতে আরও কতিপয় গ্যাসীয় পদার্থ আছে। এই সকল উপাদানের পরিমাণ সুনির্দ্দিষ্ট না হইলেও, মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে বায়ুতে :—

অম্লজান	শতকরা	২০·৬০ ভাগ
সোরাজান	,,	৭৭·১৬ ,,
অঙ্গারাম্ল	,,	·০৪ ,,
জলীয় বাষ্প	,,	১·৪০ ,,
অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস	,,	·৮০ ,,
(ক্রিপটন, নিয়ন, যেনান, হিলিয়াম, আরগন)		১০০·০০ ভাগ

ইহা ছাড়া বায়ুতে স্থানীয় পদার্থ অনুযায়ী নানা প্রকার গ্যাসও অল্পমাত্রায় মিশ্রিত থাকে। নাইট্রিক অ্যাসিড বাষ্প ও অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য ধূলিকণা সর্ব্বদা বায়ুর সহিত মিশিয়া আছে। আবার নানাপ্রকার ভাসমান জীবাণুও বায়ুতে দেখা যায়।

বায়ুতে সোরাজান, অম্লজান, অঙ্গারাম্ল ও জলীয় বাষ্প আছে তাহার প্রমাণ ও তাহাদের প্রয়োজনীয়তা :—

সোরাজান (Nitrogen) ঃ—বায়ুতে সোরাজান ও অম্লজানের তুলনায় অন্যান্য উপাদানগুলির পরিমাণ এত কম যে, সাধারণতঃ বায়ু বলিতে সোরাজান ও অম্লজানের মিশ্রণই বুঝায়। এই দুইটি গ্যাস সাধারণভাবে মিশ্রিত আছে। কোন উপায়ে একটিকে সরাইতে পারিলে অপরটির পরিচয় পাওয়া যায়। নানা প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা এই দুইটি মৌলিক পদার্থকে পৃথক করা যাইতে পারে ঃ—

পরীক্ষা ঃ—একটি বড় খোলা পাত্রে খানিকটা জল রাখ। একটি ছোট চীনামাটির পাত্রে একটি মোমবাতি বসাইয়া উহাকে পাত্রের জলে ভাসাইয়া দাও ও মোমবাতিটিকে জ্বালাইয়া দাও। মোমবাতিটি জ্বলিতে আরম্ভ করিলেই উহার উপর একটি বেলজার ঢাকা দিয়া দাও (১নং চিত্র দেখ)। লক্ষ্য করিলে দেখিবে, বাতিটির শিখা ক্রমশঃ ম্লান হইল ও শেষ পর্য্যন্ত উহা নিবিয়া গেল। এদিকে বেলজারের মধ্যে জল উঁচু হইয়া উঠিল এবং আবদ্ধ স্থানের $\frac{১}{৫}$ অংশ ভরিয়া ফেলিল। বাতির উপাদান মোম। মোম অঙ্গার ও উদজানজনিত যৌগিক পদার্থ। মোমবাতি যখন পোড়ে, তখন মোমটা গলিয়া
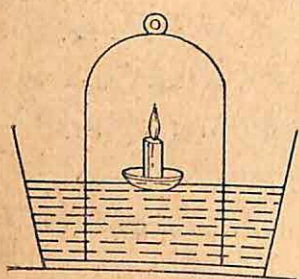
১নং চিত্র—বেলজারের ভিতর মোমবাতি ইত্যাদি প্রজ্বলন

তেলের মত তরল হয় এবং **কৈশিক আকর্ষণে** (capillary attraction) সলিতা দ্বারা উপরে উঠিতে থাকে। তপ্তস্থানে পৌঁছিবামাত্র উহা বিশ্লিষ্ট হয়। তখন উহার উপাদান অঙ্গার (carbon) ও উদজান (hydrogen) স্বতন্ত্রভাবে আবদ্ধ স্থানের বায়ুর অম্লজানের সহিত যুক্ত হইয়া যথাক্রমে **অঙ্গারাম্ল গ্যাস** (carbon dioxide) ও **জলীয় বাষ্পে** (water vapour) পরিণত হয় এবং তাপ ও আলোক সৃষ্টি করে। এই উভয় পদার্থ ই বর্ণহীন এবং জলে দ্রবণীয়। সুতরাং ঐ আবদ্ধ স্থানের বায়ুর অন্যতম প্রধান অংশ সোরাজান শুধু রহিয়া যায়। ইহাতে জারের মধ্যস্থ বায়ুর চাপ কমিয়া যায় এবং বাহিরের বায়ুমণ্ডলের চাপে জল জারের মধ্যে প্রায় $\frac{১}{৫}$ অংশ পর্য্যন্ত উঠে। এই পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, **বায়ুতে পাঁচভাগের মধ্যে একভাগ অম্লজান ও আর চারভাগই সোরাজান ও অন্যান্য গ্যাস**। বেলজারের ভিতর বায়ুতে যতক্ষণ অম্লজান ছিল মোমবাতিটি ততক্ষণ জ্বলিল। বাকীটুকু সোরাজান ও অন্যান্য গ্যাস ; উহার মধ্যে কোন জিনিস জ্বলিতে বা পুড়িতে পারে না। সেইজন্য মোমবাতি খানিকক্ষণ জ্বলিয়া নিবিয়া গিয়াছে। এই পরীক্ষা মোমবাতির পরিবর্ত্তে গন্ধক (sulphur), ম্যাগ্‌নেসিয়াম (magnesium), ফস্‌ফরাস্ (phosphorus) ইত্যাদি জ্বালাইও সম্পন্ন করা যায় এবং একই সিদ্ধান্তে—বায়ুতে পাঁচভাগের মধ্যে একভাগ অম্লজান ও আর চারভাগই সোরাজান ও অন্যান্য গ্যাস—উপনীত হওয়া যায়। আর একটি পরীক্ষা করা যাক :—

পরীক্ষা :—একটি সমান ১৮ ইঞ্চি লম্বা একমুখ বন্ধ কাচের নলকে ছয়টি সমান অংশে চিহ্নিত করিয়া লও। এইবার পরিষ্কৃত চূণের জল (lime water) ও পাইরোগেলেটের ক্ষারীয় দ্রবণ (alkaline pyrogallate solution) কাচের নলটির মধ্যে ঢাল যাহাতে ছয়টি

সমান অংশের মধ্যে একটি অংশ পরিপূর্ণ হয়। নলটির খোলা মুখ বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধর ও নলটিকে বেশভাবে ঝাকানি দিতে থাক যাহাতে নলটির অভ্যন্তরস্থ বায়ুর (নলটির সমান পাঁচ অংশে বায়ু আছে) উপাদান অম্লজান ও অঙ্গারাম্ল সম্পূর্ণভাবে পাইরো-গেলেটের ক্ষারীয় দ্রবণ (ইহা অম্লজানকে বিশোষিত করে) ও চূণের জল (ইহা অঙ্গারাম্লকে বিশোষিত করে) দ্বারা বিশোষিত হয়। এইবার নলটিকে একটি জলপূর্ণ পাত্রে দাঁড় করাইয়া তোমার বৃদ্ধাঙ্গুলি সরাইয়া লও। জল নলের মধ্যে উঠিতে থাকিবে ও আর একটি সমান চিহ্নিত অংশ ভরিয়া ফেলিবে। ইহার কারণ, নলমধ্যস্থিত আবদ্ধ বায়ুর উপাদান অম্লজান ও অঙ্গারাম্ল বিশোষিত হওয়ায় উহার চাপ কমিয়া যায় ও বাহিরের বায়ুমণ্ডলের চাপে জল নলের মধ্যে দ্বিতীয় চিহ্নিত অংশ (খোলা মুখ হইতে ধরিয়া) পর্য্যন্ত উঠে। এই পরীক্ষা হইতে প্রমাণিত হইল যে, পাঁচভাগ বায়ুর মধ্যে প্রায় একভাগ অম্লজান ও চারভাগ সোরাজান। নলের মধ্যে আর যে অম্লজান নাই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নলের তলে হাত দিয়া উহার মুখটি একখানা কাচের চাক্‌তি দ্বারা বন্ধ করিয়া নলটিকে সোজা করিয়া টেবিলের উপর বসাও। একটি পাঁকাটি জ্বালাইয়া নলের মধ্যে ধর। দেখ,
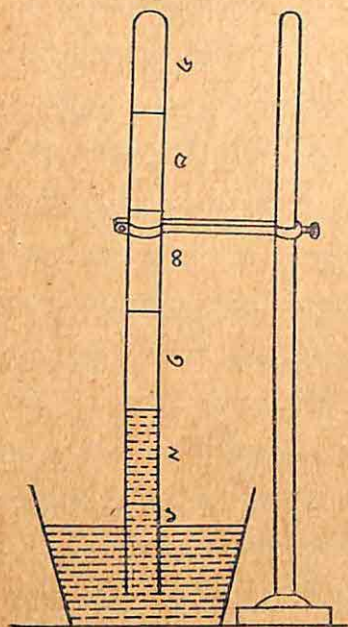
২নং চিত্র—বায়ুতে অম্লজান ও সোরাজান কি পরিমাণে মিশ্রিত আছে তাহার পরীক্ষা

উহা নিবিয়া গেল। কাজেই বুঝা গেল, এখন ঐ নলের মধ্যে অম্লজান নাই ; থাকিলে পাঁকাটি নিবিত না।

[বায়ুতে যদি সোরাজান না থাকিত তবে প্রশ্বাসে অবিমিশ্র অম্লজান গ্রহণের ফলে জীবদেহের অভ্যন্তরস্থ দহনক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন হইত এবং জীবনধারণ অতীব কষ্টকর হইত। বায়ুর অম্লজানের সহিত সোরাজান মিশ্রিত থাকায় শ্বাসকার্য্য ও তজ্জনিত দহনক্রিয়া সুষ্ঠ ও নিয়মিতরূপে হইতে পারে। জীবের পুষ্টির জন্য প্রোটিন খাদ্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এই খাদ্যের অন্যতম প্রধান উপাদান সোরাজান বায়ু হইতে আসে এবং **সোরাজান চক্রের** (Nitrogen Cycle) সাহায্যে বায়ুতে সোরাজানের সমতা রক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে বড় হয়ে তোমরা বিস্তারিত পড়বে।]

অম্লজান (Oxygen) :—বায়ুতে অম্লজানের অস্তিত্ব দেখাইবার জন্য লাভয়সিয়ের বিশ্ববিশ্রুত পরীক্ষাটি আলোচনা করা যাইতে পারে :—

পরীক্ষা :—লাভয়সিয়ে একটি বকযন্ত্রের (retort) মধ্যে খানিকটা পারদ রাখিয়া ঐ বকযন্ত্রের বাঁকা গলাটি একটা পরীক্ষ-নলের (test tube) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন (৩নং চিত্র দেখ)। উপুড় করা পরীক্ষা-নলের মুখটা আর একটা পাত্রে পারদের মধ্যে ডুবিয়া রহিল। প্রথম অবস্থায় নলের ভিতরে ও বাহিরে পারদের পৃষ্ঠ সমতলে রহিল। বকযন্ত্র ও নলের অন্তর্গত বাতাসের মধ্যে সংযোগ রহিল। কয়েকদিন ধরিয়া বকযন্ত্রে উত্তাপ দেওয়ার ফলে দেখা গেল, বকযন্ত্রের মধ্যে যে পারদ ছিল তাহার উপরে একটা লাল জিনিস জমিয়াছে এবং নলের মধ্যে পারদ কিছু উঠিয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ বাতাসের আয়তন কিছু কমিয়াছে। নলের

৩নং চিত্র—বায়ুর উপাদান সম্বন্ধে লাভয়সিয়ের পরীক্ষা

মধ্যে এখন যে বাতাস আছে তাহার মধ্যে একটা জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইলে তাহা নিবিয়া গেল।

লাভয়সিয়ে তখন পারদের উপর হইতে সেই লাল পদার্থটা লইয়া একটা পরীক্ষ-নলের মধ্যে পূরিলেন। একটা জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে একটা জলপূর্ণ কাচের জার উপুড় করিয়া বসান আছে। একটা সরু বাঁকা কাচনলের এক প্রান্ত জারের তলায় রহিল এবং তাহার অপর প্রান্ত একটা ছিপির দ্বারা পরীক্ষ-নলের মুখে আঁটিয়া দেওয়া হইল (৪নং চিত্র দেখ)। পরীক্ষ-নলকে উত্তপ্ত করা হইলে তাহার মধ্যস্থিত লাল পদার্থটি বিশ্লিষ্ট হইয়া একটা বর্ণহীন গ্যাস উৎপন্ন করিল। সেই গ্যাস বাঁকা নল দিয়া বাহির হইয়া জল ভেদ করিয়া জারের মধ্যে সঞ্চিত হইল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষায় বাতাসের আয়তন যেটুকু কমিয়াছিল, এই গ্যাসের আয়তন তাহাই। তাহা ছাড়া জ্বলন্ত কাঠি ইহার মধ্যে খুব জোরে জ্বলিতেছে।
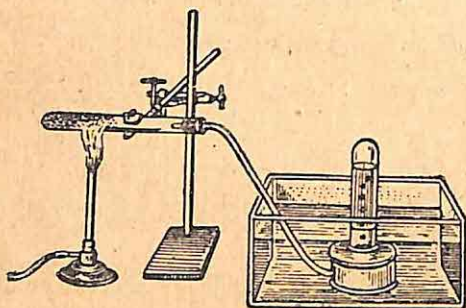
৪নং চিত্র— বায়ুর উপাদান সম্বন্ধে লাভয়সিয়ের পরীক্ষা

এই পরীক্ষা হইতে স্থির হইল যে, বাতাসের উপাদান অন্ততঃ দুইটা গ্যাস। উহাদের মধ্যে একটা দাহ্য পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেই গ্যাসে জ্বলন্ত জিনিস জোরে জ্বলে এবং তাহার দ্বারা জীবের শ্বাসক্রিয়া চলিয়া থাকে। লাভয়সিয়ে এই গ্যাসের নাম দিলেন অক্সিজেন। আমরা উহাকে বলিব **অম্লজান**। বাতাসের অপর মুখ্য উপাদানটিও বর্ণহীন গ্যাস। উহার মধ্যে কোন জিনিস জ্বলে

না এবং তাহার দ্বারা জীবের শ্বাসকার্য্যও চলে না। উহার নাম নাইট্রোজেন গ্যাস। আমরা বলিব **সোরাজান**। বায়ুমণ্ডলে অম্লজান অপেক্ষা সোরাজানের পরিমাণ অধিক।

[জীবের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে শ্বাসক্রিয়া অন্যতম। বায়ুর অম্লজান ব্যতীত এই ক্রিয়া সম্ভব নহে। বহু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্বাসক্রিয়া বলিতে প্রধানতঃ অম্লজান গ্রহণ ও অঙ্গারাম্ল ত্যাগ বুঝায়। অর্থাৎ জীব ক্রমাগত বায়ু হইতে অম্লজান টানিয়া লয় ও অঙ্গারাম্ল ত্যাগ করে। আবার ইন্ধন দহন, জৈব পদার্থের পচন ও ক্ষয় ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে বায়ুতে ক্রমাগত অঙ্গারাম্ল গ্যাসের আধিক্য হয় ও অম্লজান কমিয়া যায়। **অম্লজান চক্রের (Oxygen Cycle)** সাহায্যে বায়ুতে অম্লজানের সমতা রক্ষিত হয় (উদ্ভিদ্ দিনের বেলায় ক্লোরোফিল ও সূর্য্যালোকের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের অঙ্গারাম্লকে তাহার পাতার মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলে; অঙ্গারটুকু সে তাহার দেহ গঠনের জন্য শোষণ করে ও বিশুদ্ধ অম্লজান বায়ুমণ্ডলকে প্রত্যর্পণ করিয়া থাকে)।]

অঙ্গারাম্ল (Carbon dioxide) :—বায়ুতে অঙ্গারাম্ল আছে তাহা দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা যাইতে পারে :—

পরীক্ষা :—একটি খোলা পাত্রে খানিকটা পরিষ্কার **চূণের জল** (lime water) লইয়া বায়ুতে রাখিয়া দাও। তিন চারিদিন পরে দেখিবে উহার উপর একটা সাদা সর পড়িয়াছে এবং পরিষ্কার চূণের জল কিছু ঘোলা হইয়াছে। অঙ্গারাম্ল গ্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা পরিষ্কার চূণের জলকে কিছু ঘোলা করে। পাত্রের চূণের জল বায়ুর সংস্পর্শে থাকিয়া ঘোলা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বায়ুতে অঙ্গারাম্ল গ্যাস আছে এবং উহা বায়ুর একটা উপাদান।

[জীবের জন্য অঙ্গারাম্ল গ্যাসের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। জীবের পুষ্টির জন্য যে সমস্ত আহার্য্য বস্তুর প্রয়োজন, অঙ্গার তাহার অন্যতম প্রধান উপাদান। প্রাণীরা এই উপাদানটি প্রত্যক্ষভাবে জড়জগৎ হইতে গ্রহণ করিতে পারে না। এই উপাদান ও খাদ্যের অন্যান্য অনেক উপাদানের জন্য তাহাদের উদ্ভিদের উপরে নির্ভর করিতে হয় অর্থাৎ প্রাণীরা উদ্ভিদদেহের অংশগুলি ভোজন করিয়া এই সব উপাদানগুলি পাইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ অঙ্গার প্রত্যক্ষভাবে জড়জগৎ হইতে সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের যে পরিমাণ অঙ্গার প্রয়োজন তাহা তাহারা জীবের শ্বাসক্রিয়া হইতে উদ্ভূত অঙ্গারাম্ল গ্যাস হইতেই (উদ্ভিদ্ দিনের বেলায় ক্লোরোফিল ও সূর্য্যালোকের সাহায্যে পাতার মধ্যে অঙ্গারাম্লকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেহগঠনের জন্য অঙ্গারটুকু

শোষণ করে ও বিশুদ্ধ অম্লজান বায়ুমণ্ডলকে প্রত্যর্পণ করিয়া থাকে) পাইতে পারে। এই কারণে বায়ুতে অঙ্গারাম্লের পরিমাণ খুব অল্প এবং মোটামুটি নির্দ্দিষ্ট।]

জলীয় বাষ্প (Water vapour) :—বায়ুতে জলীয় বাষ্প রহিয়াছে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা যাইতে পারে :—

পরীক্ষা :—একটি শুষ্ক কাচের গ্লাসে বরফ রাখিয়া দিলে ধীরে ধীরে গ্লাসের বাহিরে বিন্দু বিন্দু জল জমিতে থাকে। বায়ুর জলীয় বাষ্প শীতল হইয়া ঘনীভূত হয় এবং তরলাকারে গ্লাসের শীতল গাত্রে সঞ্চিত হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, জলীয় বাষ্প বায়ুর একটি উপাদান।

[বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকার দরুণ বাষ্পীভবন ক্রিয়ার (evaporation) মাত্রাধিক্য হওয়া সম্ভব নয় (কারণ কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় নির্দ্দিষ্ট আয়তনের বায়ু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প গ্রহণ করিতে পারে) এবং ফলে এই ক্রিয়ার দরুণ পৃথিবীতে জলের অনটন হয় না। আবার বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প শীতল হইয়া তুষার, শিশির, মেঘ ও বৃষ্টিতে পরিণত হয়। এই জল নদী-নালা বাহিয়া সাগরে বা হ্রদে আসে এবং পুনরায় বাষ্পীভূত হইয়া যায়। পৃথিবীতে সতত এই পরিবর্ত্তন-চক্র (Water Cycle) আছে বলিয়াই জীবজগতের অস্তিত্ব সম্ভব।]

বায়ু মিশ্র পদার্থ, যৌগিক পদার্থ নহে (Air is a mechanical mixture and not a chemical compound) :—বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ, যৌগিক পদার্থ নহে। লাভয়সিয়ের পরীক্ষা হইতে এবং তোমরা নিজে যে সব পরীক্ষা করিলে তাহা হইতে দেখিয়াছ যে, বায়ুর প্রধান উপাদান অম্লজান ও সোরাজান। আয়তন হিসাবে বায়ুর মধ্যে অম্লজান একভাগ এবং সোরাজান চারিভাগ থাকে। **বায়ু যে যৌগিক পদার্থ নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ নিম্নে দেওয়া হইল** :—

১। বায়ুর উপাদানগুলিকে সহজেই পৃথক করা যাইতে পারে; যৌগিক পদার্থ হইলে বায়ুর উপাদানগুলিকে পৃথক করা সহজসাধ্য হইত না।

২। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সকল স্থানে ও সকল সময়ে বায়ুর অম্লজান ও সোরাজানের ভাগ নির্দ্দিষ্ট নহে। সমুদ্রের ধারে ও পর্ব্বতের উপরে

অম্লজানের ভাগ বেশী এবং বড় বড় শহরে ও খনিতে সোরাজানের ভাগ বেশী। বায়ু যৌগিক পদার্থ হইলে উহার উপাদানের ভাগ নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

৩। যদি একভাগ অম্লজান ও চারিভাগ সোরাজান মিশ্রিত করা যায়, তবে ইহার ধর্ম্ম বায়ুর মত হয়। কিন্তু মিশ্রণ করিবার সময় উষ্ণতার কোন তারতম্য হয় না। বায়ু যৌগিক পদার্থ হইলে কখনও ইহা সম্ভবপর হইত না।

৪। তরল বায়ুকে **আংশিক পাতন** (Fractional distillation) করিলে প্রথমে সোরাজান বাহির হইয়া আসে, পরে অম্লজান বাহির হয়। বায়ু যৌগিক পদার্থ হইলে ইহা কখনও সম্ভবপর হইত না।

অনুশীলন

১। বায়ুতে যে অম্লজান, সোরাজান ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস আছে তাহা পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। বায়ুকে মিশ্র পদার্থ মনে করিবার কারণ কি ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্বাসক্রিয়া, দহন ও মরিচা

শ্বাসক্রিয়া জীবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। জীবদেহে এই ক্রিয়া দিবারাত্র সমানভাবে চলিতেছে। জীবের বিভিন্ন কার্য্যের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা আসে তাপশক্তি হইতে। জীবদেহে এই তাপশক্তির উদ্ভব হয় সঞ্চিত ও শোষিত খাদ্যবস্তুর দহনের ফলে। খাদ্যবস্তুর দহনের জন্য যে অম্লজান আবশ্যক হয়, তাহা জীব বায়ু হইতে গ্রহণ করে। শ্বাসগ্রহণে বাহিরের বায়ু জীবদেহে প্রবেশ করে ও শ্বাসত্যাগে সেই বায়ু বহির্গত হইয়া যায় (শ্বাসক্রিয়া বলিতে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ বুঝায়)। বহু প্রকার পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, এই দুই বায়ুতে প্রধানতঃ অম্লজান ও অঙ্গারাম্লর পরিমাণের তারতম্য হয়। শ্বাসগ্রহণ বায়ুতে যে

পরিমাণ অম্লজান ও অঙ্গারাম্ল থাকে শ্বাসত্যাগ বায়ুতে তাহা থাকে না—অম্লজানের পরিমাণ কমিয়া যায় ও অঙ্গারাম্লের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। সেইজন্য শ্বাসক্রিয়া বলিতে অম্লজান গ্রহণ ও অঙ্গারাম্ল ত্যাগ বুঝায়।

শ্বাসক্রিয়ার জন্য উচ্চতর প্রাণীদের (যেমন মানুষ, বানর, পাখী ইত্যাদি স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রাণী) বিশেষ যন্ত্র থাকে (যেমন নাসিকা, ফুস্‌ফুস্ ইত্যাদি) এবং এই যন্ত্রগুলির সাহায্যে তাহাদের শ্বাসকার্য্য চলে। নিম্নতর প্রাণীদের সেইরূপ কোন বিশেষ যন্ত্র না থাকিলেও দেহের ত্বক্ ও বিভিন্ন রন্ধ্র দ্বারা এই ক্রিয়া চলে। কীট-পতঙ্গের গায়ে যে সকল ছিদ্র থাকে তাহার ভিতর দিয়া উহাদের শ্বাসকার্য্য চলে। মাছেরা তাহাদের ফুল্কোর সাহায্যে দ্রবীভূত বাতাস হইতে অম্লজান টানিয়া লয়। বিশেষ যন্ত্র না থাকিলেও উদ্ভিদ্ ত্বক্ এমন কি সর্ব্বদেহ দ্বারা এই কার্য্য চালায়। যে উপায়েই হউক, জীবনধারণের জন্য এই ক্রিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই ক্রিয়ার অভাবে জীব কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণী যে দিবারাত্র শ্বাসকার্য্য (অম্লজান গ্রহণ ও অঙ্গারাম্ল ত্যাগ) চালায় তাহার জন্য নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা যাইতে পারে :—

১-ছিপি ; ২-অঙ্কুরিত মটর বীজ
৫নং চিত্র—উদ্ভিদের শ্বাসগ্রহণ পরীক্ষা

উদ্ভিদের শ্বাসগ্রহণের পরীক্ষা :— (১) কতকগুলি মটরবীজ একদিন দুইদিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া একটি বোতলে রাখ ও উহার মুখ বন্ধ কর। বেশ কিছু ঘণ্টা পরে একটি জ্বলন্ত পাঁকাটি বোতলে প্রবেশ করাইলে দেখিবে, উহা নিবিয়া গেল। ইহার কারণ বোতলের ভিতর বায়ুতে আর অম্লজান নাই (অম্লজান থাকিলে
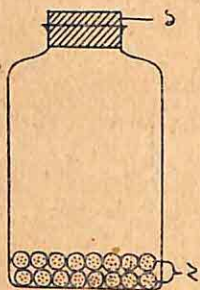
জ্বলন্ত পাঁকাটি আরও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিত—অম্লজান গ্যাসের ইহাই একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম); শ্বাসক্রিয়ায় নিঃশেষিত হইয়াছে। জ্বলন্ত পাঁকাটির পরিবর্ত্তে একটু পরিষ্কার চূণের জল ঐ বোতলে ঢালিলে দেখা যাইবে, চূণের জল ঘোলা হইয়া গেল—অঙ্গারাম্ল গ্যাসের ইহাই একটি বিশিষ্ট ধর্ম। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, শ্বাসক্রিয়ায় উদ্ভিদ্ অম্লজান গ্রহণ করে ও অঙ্গারাম্ল ত্যাগ করে।

প্রাণীর শ্বাসগ্রহণের পরীক্ষা :—(১) উপরিউক্ত পরীক্ষা মটর বীজের বদলে একটি নেংটি ইঁদুর লইয়া করিলে ঐ একই ফল পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণীরা শ্বাসক্রিয়ায় অম্লজান গ্রহণ করে ও অঙ্গারাম্ল ত্যাগ করে। আরও একটি সহজ পরীক্ষা করা যাক্ :—(২) একটি পাত্রে কিছু পরিষ্কার চূণের জল লও। ঐ জলের ভিতর একটি সাইকেল পাম্পের মুখ ঢুকাইয়া উহার সাহায্যে খুব বাতাস দিতে থাক। কিছুক্ষণ দিবার পরেও দেখিবে, চূণের জলের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না। এখন একটি কাচের নলের এক প্রান্ত ঐ চূণের জলে রাখিয়া মুখ দিয়া ফুঁ দিতে থাক (৬নং চিত্র দেখ)। এইরূপ ২।৩ মিনিট করার পর দেখিবে, চূণের জল ঘোলা হইয়া গেল। শ্বাস-ত্যাগের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গারাম্ল বাহির হইয়া চূণের জলকে ঘোলা করিল। এই যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গারাম্লের উদ্ভব হয়, অম্লজান কর্ত্তৃক সঞ্চিত ও শোষিত খাদ্যবস্তুর দহনের ফলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাণীরা শ্বাসক্রিয়ায় অম্লজান গ্রহণ করে ও অঙ্গারাম্ল ত্যাগ করে।

৬নং চিত্র—প্রাণীর শ্বাসগ্রহণ পরীক্ষা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জীবনধারণের জন্য শ্বাসক্রিয়া নিতান্ত

প্রয়োজনীয়। এই ক্রিয়ার অভাবে জীব কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা আমরা তাহা প্রমাণ করিতে পারি :—

পরীক্ষা :—একটি নেংটি ইঁদুর বাত-পাম্পের রেকাবির উপর রাখিয়া বেলজার চাপা দাও। বেলজার ও রেকাবির জোড়মুখে একটু ভ্যাস্‌লিন লাগাইয়া দাও, যাহাতে বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। এইবার পাম্পের সাহায্যে বেলজার হইতে সমস্ত বায়ু টানিয়া লও। কিছু-ক্ষণ বাদে বেলজার খুলিলে দেখিতে পাইবে, ইঁদুর শ্বাসক্রিয়ার অভাবে (বেলজারের ভিতর বায়ু নাই) মরিয়া গিয়াছে।

৭নং চিত্র—শ্বাসক্রিয়া ব্যতীত প্রাণীর জীবনধারণ সম্ভব নয় তাহার পরীক্ষা

(২) একটি টবের গাছ বাত-পাম্পের রেকাবিতে রাখিয়া বেলজার চাপা দাও। বেলজার ও রেকাবির জোড়মুখে একটু ভ্যাস্‌লিন লাগাইয়া দাও, যাহাতে বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। এইবার পাম্পের সাহায্যে বেলজার হইতে সমস্ত বায়ু
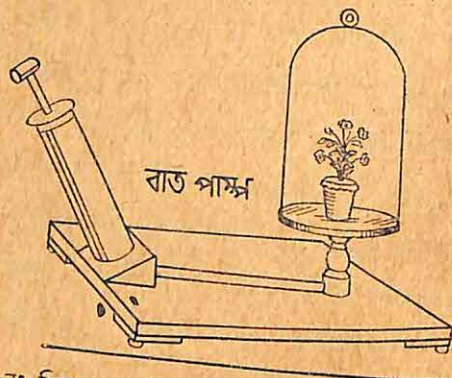
৮নং চিত্র—শ্বাসক্রিয়া ব্যতীত উদ্ভিদের জীবনধারণ সম্ভব নয় তাহার পরীক্ষা

টানিয়া লও। কিছুদিন বাদে বেলজার খুলিয়া দেখিবে, টবের গাছ শ্বাসক্রিয়ার অভাবে মরিয়া গিয়াছে। টবের গাছটি বায়ুর অম্লজানের অভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে মরিয়া যায় না, কারণ আগত শ্বাসক্রিয়া (anaerobic respiration) দ্বারা উহা কিছুদিন বাঁচিয়া থাকে। এই দুই পরীক্ষা হইতে আমরা বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলাম যে, জীবনধারণের জন্য শ্বাসক্রিয়া একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এই ক্রিয়া বায়ুর অম্লজান ব্যতীত সম্ভবপর নহে।

দহন (Combustion) :—দহন একটি রাসায়নিক ক্রিয়া। কাঠখানা যখন পোড়ে, উত্তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত খানিকটা ভস্ম বা ছাই পড়িয়া থাকে। বাতিটা পুড়িবার সময় অগ্নিশিখা, আলোক ও উত্তাপ জন্মে, কিন্তু ভস্ম দেখা যায় না। খানিকটা ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতুর তারকে জ্বালাও। তীব্র সাদা আলোক উৎপন্ন হইল এবং সামান্য সাদা ছাই পড়িয়া রহিল। এই ব্যাপারকে পোড়া, জ্বলন বা দহন বলে এবং এইগুলি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সংঘটিত হয়।

জ্বলন্ত কাঠখানার উপর মাটি চাপা দাও, আগুন নিবিয়া যাইবে। জ্বলন্ত বাতিটার উপর একটা গেলাস উপুড় করিয়া ঢাকা দাও। একটু পরে গেলাস তুলিয়া দেখ, বাতি জ্বলিতেছে না ; নিবিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বেশ মনে হয়, বাতাস না পাইলে কোন জিনিস জ্বলে না অর্থাৎ বাতাসের অভাবে রাসায়নিক ক্রিয়াগুলি বন্ধ হইয়া যায়। বায়ুর যে উপাদান এই কার্য্যে সহায়তা করে তাহার নাম অম্লজান।

দহনের তথ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদের যে ধারণা ছিল, তাহা অষ্টাদশ শতব্দীর শেষার্দ্ধে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক **লাভয়সিয়ে** যুক্তি ও পরীক্ষা দ্বারা খণ্ডন করিলেন ও প্রমাণ করিলেন যে, দহন একটি রাসায়নিক ক্রিয়া ও সাধারণ দহনক্রিয়া ও

ভস্মীকরণ ক্রিয়া (ordinary combustion and calcination) বায়ুর অম্লজানের দরুণ সংঘটিত হয়। ইহা হইতে এই ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, দহন অম্লজান ব্যতীত সম্ভব নহে। কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা অম্লজান ছাড়াও জ্বলিতে পারে—যেমন উদজান (hydrogen), আরসেনিক (arsenic) ইত্যাদি ক্লোরিণ (chlorine) গ্যাসে প্রজ্বলিত হয়। সুতরাং অম্লজান ভিন্ন দহনক্রিয়া সম্ভব নয় মনে করা ঠিক নয়। অবশ্য অধিকাংশ দহনক্রিয়াতে অম্লজান অংশ গ্রহণ করে। **যদি কোন রাসায়নিক মিলনের ফলে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই রাসায়নিক মিলনকে আমরা দহন** (combustion) **বলিব।**

দাহ্যবস্তু ও দাহক :—সাধারণতঃ দহনক্রিয়াতে যে বস্তুগুলি অংশ গ্রহণ করে তাহাদের একটি অংশকে **দাহবস্তু** (combustible substances) ও অপর অংশকে **দাহক** (supporter of combustion) বলা হয়। যখন কাঠখানা পোড়ে, তখন কাঠকে দাহ্যবস্তু ও বাতাসকে দাহক বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দাহ্য ও দাহক পদার্থের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আপাত-দৃষ্টিতে দাহ্যবস্তু দাহকের কাজ করিয়া অপরকে দাহ্যবস্তুতে পরিণত করিতে পারে। ৯নং চিত্রে একটি চিমণীর ভিতর দুই নলের সাহায্যে বায়ু ও কোলগ্যাস প্রবেশ করাইয়া বায়ুকে ভিতরে কোলগ্যাসকে চিমণীর উপরে প্রজ্বলিত করা যাইতে পারে। চিমণীর ভিতর বায়ু দাহ্যবস্তু ও কোলগ্যাস দাহক। আবার চিমণীর বাহিরে কোলগ্যাস দাহ্যবস্তু ও বায়ু দাহক।
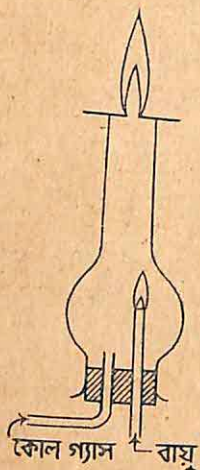
৯নং চিত্র—দাহ্যবস্তু ও দাহকের মধ্যে প্রভেদ নাই তাহার পরীক্ষা

মরিচা (Rust) :—মরিচা একটি রাসায়নিক ক্রিয়া। ইহা

লোহা, জল ও অম্লজানের গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয়। শিরিষ কাগজ দ্বারা এক টুক্‌রা লোহার চারিদিক ঘষিয়া বেশ পরিষ্কার কর। এখন উহাকে জলে ভিজাইয়া একটা পাত্রের উপর রাখিয়া দাও। দুই এক দিন পরে দেখ, উহা আর চক্‌চকে নাই। স্পর্শ করিয়া দেখ, তোমার আঙুলে বাদামী রঙের গুঁড়া লাগিয়া গেল। এই গুঁড়াকে **মরিচা** বলে। বেশী দিন ধরিয়া লোহাকে এই অবস্থায় রাখিলে ক্রমশঃ উহার সমস্তটাই এইরূপ মরিচায় পরিবর্ত্তিত হইবে। ইহা হইতে তোমাদের মনে হইতে পারে যে, লোহা জলের সংস্পর্শে আসিল ইহার উপর মরিচা পড়ে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। এই ক্রিয়ার জন্য জলের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি অম্লজানের প্রয়োজন আছে। নিম্নের পরীক্ষা হইতে ইহা বুঝিতে পারিবে।

পরীক্ষা ঃ—একটি কাচকূপীতে (flask) কিছু জল লইয়া উহার ভিতর কতকগুলি নূতন লোহার পেরেক রাখ এবং একটি লাম্পের সাহায্যে জলকে উত্তপ্ত করিতে থাক (১০নং চিত্র দেখ)। জলে সাধারণতঃ কিছু বায়ু দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। জলকে ফুটাইলে উক্ত দ্রবীভূত বায়ু জল হইতে বহির্গত হইয়া যায় এবং জলীয় বাষ্প কাচকূপীর অভ্যন্তরস্থ বায়ুকেও বিদূরিত করে। এখন কাচকূপীটির মুখে ভাল করিয়া ছিপি আটিয়া দাও এবং আগুন হইতে উহাকে সরাইয়া লও। কূপীটির মধ্যে পেরেক, জল ও জলীয় বাষ্প ছাড়া আর কিছুই নাই।
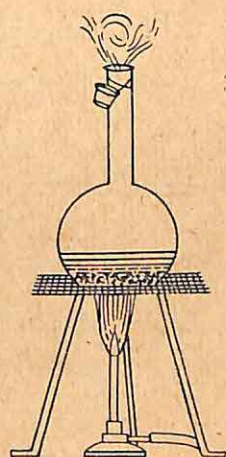
১০নং চিত্র—মরিচা সম্বন্ধে পরীক্ষা

৪।৫ দিন পরে ছিপি খুলিয়া পেরেকগুলি পরীক্ষা করিলে দেখিবে

যে, উহারা বেশ চক্‌চকেই আছে এবং উহাদের উপর কোন মরিচা ধরে নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, শুধু জলের সাহায্যে মরিচা হয় না; বায়ুরও প্রয়োজন আছে এবং বায়ুর যে উপাদান এই ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে তাহার নাম অম্লজান। নিম্নের পরীক্ষা হইতে ইহা বুঝিতে পারিবে।

পরীক্ষা ঃ—কতকগুলি চক্‌চকে ছোট নির্দ্দিষ্ট ওজনের লোহার পেরেককে এক টুকরা ভিজা কাপড়ে বাঁধিয়া একটা পুঁটলি কর। পুঁটলিটা একটা কাঠির মাথায় বাঁধিয়া একটা কাচের জারের মধ্যে ঢুকাইয়া দাও। এখন জারটাকে উল্টাইয়া একটা জলপাত্রের উপর বসাইয়া রাখ (১১নং চিত্র দেখ)। লক্ষ্য করিয়া দেখ, জারের ভিতরে ও বাহিরে জল একই সমতলে আছে। দুই তিনদিন পরে দেখিবে, জারের মধ্যে জল উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে জারের ভিতর যে বাতাসটুকু ছিল, তাহার আয়তনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এখন জলে ভর্ত্তি হইয়াছে। এখন জারের ভিতরকার বাতাসটায় কি আছে দেখা যাক। জলের তলে হাত দিয়া জারের মুখটা একখানা কাচের চাক্‌তি দ্বারা বন্ধ করিয়া জারটিকে এইবার সোজা করিয়া টেবিলের উপর বসাও। একটা পাঁকাটি জ্বালাইয়া জারের মধ্যে ধর। দেখ, উহা নিবিয়া গেল। কাজেই বুঝা গেল, এখন জারের ভিতর অম্লজান নাই; থাকিলে পাঁকাটি নিবিত না। পাঁকাটি নিবাইয়া দেওয়া কাহার ধর্ম্ম? সোরাজান গ্যাসের। এইবার পুঁটলি খুলিয়া দেখ, পেরেকগুলি আর চক্‌চকে নাই। উহার উপর যথেষ্ট মরিচা পড়িয়াছে।
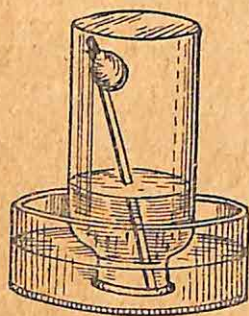
১১নং চিত্র—মরিচা সম্বন্ধে পরীক্ষা

ওজন করিয়া দেখ, উহাদের ওজন পূর্ব্বের মত নাই; একটু বাড়িয়াছে।

এই মরিচা জিনিসটা কি? **মরিচা একটি যৌগিক পদার্থ। ইহা লোহা, জল বা জলীয় বাষ্প ও অম্লজান গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয়।**

দহন ও মরিচা (Combustion and Rust) :—তোমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছ, দহনক্রিয়াতে দাহ্যমান পদার্থের উপাদান বায়ুর অম্লজানের সহিত সম্মিলিত হইয়া যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করিয়া থাকে। মরিচা-পড়াতেও আমরা লক্ষ্য করিলাম যে ইহা লোহা, জল বা জলীয় বাষ্প ও বায়ুর অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয়। **সুতরাং মরিচা-পড়া ও দহনক্রিয়া মূলতঃ একই কার্য্য।** তবে উহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, দহনক্রিয়াতে রাসায়নিক সংযোগ খুব শীঘ্র হয় এবং তাহার ফলে উত্তাপ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। মরিচা প্রস্তুত হইবার সময় ঐ ক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য উত্তাপ চারিদিকে সঞ্চালিত হইয়া যায় এবং আলোক উৎপন্ন হয় না। অতএব মরিচা ধরাকে ঠিক দহন না বলিয়া মৃদু দহন (slow combustion) বলা যাইতে পারে।

শ্বাসকার্য্য ও দহনক্রিয়া (Respiration & combustion) :— উচ্চতর প্রাণীদের নাসিকা, ফুস্‌ফুস্ ইত্যাদি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে দেহে নিয়ত শ্বাসকার্য্য চলে। নিম্নতর প্রাণীদের সেইরূপ কোন বিশেষ যন্ত্র না থাকিলেও দেহের ত্বক্ ও বিভিন্ন রন্ধ্র দ্বারা এই কার্য্য চলে। কীটপতঙ্গের গায়ে যে সকল ছিদ্র থাকে তাহার ভিতর দিয়া উহাদের শ্বাসকার্য্য চলে। মাছেরা তাহাদের ফুল্কোর সাহায্যে জলে দ্রবীভূত বাতাস হইতে অম্লজান টানিয়া লয়। বিশেষ যন্ত্র না থাকিলেও উদ্ভিদ্ পত্র, ত্বক্ এমন কি সর্ব্বদেহ দ্বারা এই কার্য্য চালায়। পূর্ব্বেই আমরা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত

করিয়াছি. জীবনধারণের জন্য এই ক্রিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জীবের বিভিন্ন কার্য্যের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাহা আসে তাপশক্তি হইতে। জীবদেহে এই তাপশক্তির উদ্ভব হয় তাহার সঞ্চিত ও শোষিত খাদ্যবস্তুর দহনের ফলে। খাদ্যবস্তুর দহনের জন্য যে অম্লজান আবশ্যক হয় তাহা জীব নিয়তই বায়ু হইতে গ্রহণ করে। তবে এই দহন মোমবাতি দহনের মত তীব্র নহে—লৌহের মরিচা ধরার মত ধীরে ধীরে সাধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহাকে ঠিক দহন না বলিয়া মৃদু দহন বলা যাইতে পারে।

দহন ও শ্বাসকার্য্যের তুলনা

দহন	শ্বাসকার্য্য
(১) দহনের সময় দাহ্য বস্তুর সহিত অম্লজানের খুব দ্রুত রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হয়।	(১) শ্বাসকার্য্যে জীবদেহস্থিত সঞ্চিত ও শোষিত খাদ্যবস্তুর অম্লজানের সহিত মৃদু রাসায়নিক ক্রিয়া হয়।
(২) দহনকালে আলো ও তাপ সৃষ্টি হয় এবং বিবিধ গ্যাস ও অক্সাইড উৎপন্ন হয়।	(২) শ্বাসকার্য্যের সময় তাপ সৃষ্টি হয় ও প্রধানতঃ অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হয়।
(৩) সাধারণতঃ দহন কার্য্যে অগ্নি সংযোগ দরকার।	(৩) শ্বাসকার্য্যে অগ্নি সংযোগ দরকার হয় না।

অনুশীলন

১। দহন বলিতে কি বুঝ? দহনের সহিত শ্বাসকার্য্যের তুলনা কর।

২। মরিচা জিনিসটা কি? অম্লজান ব্যতীত এই ক্রিয়া যে সম্ভবপর নয় তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

মিশ্র ও যৌগিক পদার্থ

আমরা চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থ দেখিতে পাই তাহাদের বিশ্লেষণ করিলে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, উহাদের উপাদান এক বা একাধিক **মৌলিক পদার্থ** বা **মৌল**। আমরা প্রায় ৯২টি মৌলিক পদার্থের বিষয় অবগত আছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে, মৌলিক পদার্থ বলিতে আমরা কি বুঝি ?

মৌলিক পদার্থ (Element) :—যে সকল পদার্থ বিশ্লেষণ করিলে তাহা হইতে আরও সরল ও অপর কোন বিভিন্ন ধর্ম্ম-বিশিষ্ট পদার্থ পাওয়া যায় না, তাহাদিগকে **মৌলিক পদার্থ** বা **মৌল** বলে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা প্রায় ৯২টি মৌলিক পদার্থের বিষয় অবগত আছি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি **ধাতু** (Metals)—যেমন লৌহ, তাম্র, রোপ্য, স্বর্ণ ইত্যাদি ; কতকগুলি **অধাতু** (Non-metals)—যেমন উদজান, অম্লজান, অঙ্গার, গন্ধক ইত্যাদি ; কতকগুলি **ধাতুকল্প** (Metalloids)—যেমন আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি ইত্যাদি। লৌহ, উদজান, আর্সেনিক ইত্যাদি পদার্থ-গুলিকে বিশ্লেষণ করিলে, তাহা হইতে আরও সরল ও অন্য কোন বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ পাওয়া যায় না এবং সেইজন্য ইহারা মৌলিক পদার্থ।

যৌগিক পদার্থ (Compound) :—দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের **রাসায়নিক সংযোগে** (chemical combination) যদি কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাহাতে মূল পদার্থের গুণ ও ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং যাহাকে বিশ্লেষণ করিলে আরও সরল ও বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে **যৌগিক পদার্থ** বা **যৌগ** বলে। যৌগিক পদার্থে উহার উপাদানগুলি একেবারে

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে; যেমন জল, লবণ, খড়ি, পোটাসিয়াম ক্লোরেট ইত্যাদি।

মিশ্র পদার্থ (Mechanical Mixture) :—দুই বা ততোধিক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের সাধারণ মিশ্রণে (রাসায়নিক সংযোগ নহে) যে বস্তুর সৃষ্টি হয় এবং যাহাতে প্রত্যেকটি মিশ্রিত পদার্থের নিজ নিজ গুণ ও ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহাকে **মিশ্র পদার্থ** বলে। মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলি সহজভাবে ও নানা স্থূল উপায়ে পৃথক করা যায়। বায়ু, বারুদ ইত্যাদি মিশ্র পদার্থ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পদার্থমাত্রই চরম বিশ্লেষণে এক বা একাধিক মৌলের সন্ধান দেয়। প্রত্যেক মৌল কতকগুলি **অণুর** (Molecule) সমষ্টি। অণুগুলি আবার কতকগুলি ক্ষুদ্রতর কণার সমষ্টি। ইহাদিগকে **পরমাণু** (Atom) বলে। একই মৌলের সকল পরমাণু একই প্রকার; বিভিন্ন মৌলের পরমাণু বিভিন্ন। কোন যৌগিক পদার্থ যে সকল মৌলে প্রস্তুত, ঐ যৌগের অণুতে সেই সকল মৌলের পরমাণু থাকে। জলের একটি অণুতে উদজানের দুইটি ও অম্লজানের একটি পরমাণু থাকে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, যে সকল পদার্থের অণু কেবলমাত্র একই প্রকার পরমাণুতে গঠিত, তাহারা মৌল এবং যাহাদের অণু দুই বা অধিক সংখ্যক বিভিন্ন প্রকৃতির পরমাণু সংযোগে গঠিত, তাহারা যৌগ।

এইবার আমরা মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। নিম্নের পরীক্ষা হইতে ইহাদের পার্থক্য সহজেই বুঝা যায়।

পরীক্ষা :—খানিকটা গন্ধক ও লোহার গুঁড়াকে খলের মধ্যে ফেলিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে দেখা যাইবে :—

(ক) মিশ্রিত পদার্থের বর্ণ কালো ও হল্‌দের (লোহার গুঁড়া কালো ও

গন্ধকের গুঁড়া হল্‌দে) মাঝামাঝি অর্থাৎ উহাতে গন্ধক ও লৌহ উভয়েরই বর্ণ-গুণ বর্ত্তমান।

(খ) ঐ গুঁড়াকে একখানা চুম্বক দিয়া নাড়াচাড়া করিলে দেখিবে, লোহার কণাগুলি চুম্বকে লাগিয়া গেল, পড়িয়া রহিল কেবল গন্ধক। কাজেই দেখ, ঐ মিশ্রিত পদার্থে লোহার এই গুণটাও বর্ত্তমান।

(গ) লেন্‌স (Lens) দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, হল্‌দে গন্ধক কণার পাশে পাশে কালো লোহার কণাগুলি রহিয়াছে। সুতরাং লোহার অণু বা পরমাণুর সহিত গন্ধকের অণু বা পরমাণুর মিলন হইয়া নূতন অণুর সৃষ্টি হয় নাই।

(ঘ) ঐ পদার্থটিকে একটি পরীক্ষ-নলে লইয়া তাহাতে কার্ব্বন ডাই-সাল্‌ফাইড (carbon di-sulphide) ঢালিলে, গন্ধক সেই তরল পদার্থে দ্রবীভূত হইবে, কিন্তু লৌহ হইবে না এবং পরিস্রুতি ক্রিয়ার সাহায্যে ঐ দ্রব হইতে লৌহচূর্ণকে পৃথক করা যাইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, লৌহ ও গন্ধকের মিশ্রণে প্রত্যেক পদার্থের নিজ নিজ ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। এইরূপ মিশ্রণের ফলে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহার নাম **মিশ্র পদার্থ** এবং মিশ্রণের নাম **সাধারণ মিশ্রণ**।

মিশ্র পদার্থে উপাদানগুলির ধর্ম্মের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না, একটিকে অপরটি হইতে পৃথক্ করা যায় এবং ঐ সকল উপাদান যে কোন অনুপাতে মিশিয়া থাকিতে পারে।

এইবার লৌহ ও গন্ধকের মধ্যে **রাসায়নিক সংযোগে** (chemical combination) যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করিয়া (রাসায়নিক সংযোগ ব্যতীত যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় না) উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি করা যাক্।

পরীক্ষা :—গন্ধক ও লোহার মিশ্রিত পদার্থকে একটি পরীক্ষ-নলে লইয়া খুব উত্তপ্ত কর ; পরে পরীক্ষ-নলটি ভাঙ্গিয়া ভিতরের পদার্থটি বাহির কর।

(ক) দেখা যাইবে, পদার্থটির বর্ণ কালো হইয়াছে এবং উহা লৌহ ও গন্ধকের বর্ণের মাঝামাঝি নয়।

(খ) পদার্থটির উপর চুম্বক স্পর্শ করিলে চুম্বকের গায়ে কিছু লাগিবে না।

(গ) পদার্থটিকে গুঁড়া করিয়া লেন্‌স দ্বারা পরীক্ষা কর। দেখ, হলদে গন্ধক ও কালো লোহার কণাকে পৃথকভাবে চেনা যায় না। সব দানাগুলিই কালো।
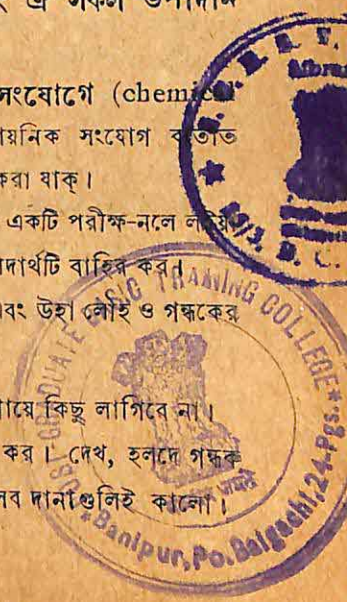
(ঘ) কার্ব্বন ডাই-সাল্‌ফাইডে কোন অংশ দ্রব হইবে না।

কাজেই দেখ, এখন উহার মধ্যে গন্ধক ও লোহার কোনও ধর্ম্মই নাই, অথচ উহাতে ঐ পদার্থই আছে। ইহার কারণ এই যে, উত্তাপ প্রয়োগের ফলে লোহার পরমাণু গন্ধকের পরমাণুর সহিত রাসায়নিক শক্তির বলে সংহত হইয়া নূতন যৌগিক অণুর সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ঐ কালো জিনিসটি একটি যৌগিক পদার্থ। রাসায়নিক সংযোগের ফলে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে উপাদানগত মৌলিক পদার্থের কোনও ধর্ম্মই বজায় থাকে না। যখন রাসায়নিক উপায়ে অণুগুলি ভাঙ্গিয়া আবার উপাদানগুলিকে পৃথক করা হয়, তখন পুনরায় উহাদের মূল ধর্ম্ম প্রকাশ পায়।

মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের তুলনা

মিশ্র পদার্থ	যৌগিক পদার্থ
(১) মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলি কখনও মিলিয়া এক হয় না ; এক পদার্থের কণার পার্শ্বে অপর পদার্থের কণা থাকিয়া যায় অর্থাৎ মিশ্র পদার্থ অসমসত্ত্ব (heterogeneous)।	(১) যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলি মিশিয়া এক হইয়া যায় ; সেইজন্যই ইহা সমসত্ত্ব (homogeneous)।
(২) মিশ্র পদার্থের ধর্ম্ম উহার উপাদান-গুলির ধর্ম্মের সমষ্টি ; মিশ্রিত অবস্থাতেও উপাদানগুলির স্ব স্ব ধর্ম্ম বজায় থাকে।	(২) যৌগিক পদার্থের ধর্ম্ম উহার উপাদান-গুলির ধর্ম্ম হইতে পৃথক ও নূতন।
(৩) মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নয় ; গন্ধক ও লোহার মিশ্র পদার্থ প্রস্তুতকরণে উভয় উপাদান যে কোন পরিমাণে লওয়া যায়।	(৩) যৌগিক পদার্থে উপাদানগুলির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ; ১৮ ভাগ জলে ১৬ ভাগ অম্লজান ও ২ ভাগ উদজান থাকিবে ; ইহার ব্যতিক্রম কোন মতেই সম্ভব নয়।
(৪) মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলিকে পৃথক করা সহজ ও যান্ত্রিক (mechanical) উপায়েই সম্ভব।	(৪) ইহার উপাদানগুলিকে সহজে পৃথক করা যায় না ; পৃথকীকরণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

অনুশীলন

১। মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ বলিতে কি বুঝ ?

২। মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের তুলনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

জল ও উহার উপাদান ; বায়ু ও জলের উপাদানগুলির সম্বন্ধে আলোচনা

প্রাচীনকাল হইতে জলকে মৌলিক পদার্থ বলিয়া মনে করা হইত। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক **ক্যাভেণ্ডিস** (Cavendish) বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রথম প্রমাণ করেন, জল একটি যৌগিক পদার্থ। উহা উদজান ও অম্লজান গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জল যৌগিক পদার্থ (Water is a chemical compound) :—জল যে যৌগিক পদার্থ, মৌলিক বা মিশ্র পদার্থ নহে তাহার কতকগুলি কারণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) উহার উপাদানদ্বয়ের পরিমাণ সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট (যে কোন প্রকারের জল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ১৮ ভাগ জলের মধ্যে ১৬ ভাগ অম্লজান ও ২ ভাগ উদজান) ; কখনও বেশী কম হইবে না।

(২) উহার উপাদানদ্বয়কে বিশেষ বৈজ্ঞানিক উপায় ব্যতীত সহজে পৃথক করা যায় না।

(৩) উহার উপাদানদ্বয়ের ধর্ম্ম যৌগিক পদার্থের ধর্ম্মটি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

প্রকৃতিতে জলের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। এই প্রাচুর্য্যের কারণ যাহাই হউক না কেন, পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে জল ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। প্রকৃতিতে ইহাকে আমরা তিনটি বিভিন্ন অবস্থায় পাই :—

(ক) **কঠিন** অবস্থায় (As Solid)—কঠিন অবস্থায় আমরা জলকে তুষার, শিলা ইত্যাদি আকারে মেরুপ্রদেশ, উচ্চ পর্ব্বত-শিখর ইত্যাদি স্থানে দেখিতে পাই।

(খ) **তরল** অবস্থায় (As Liquid)—তরল অবস্থায় ইহাকে আমরা জলের আকারে পাইয়া থাকি। ভূপৃষ্ঠের চার ভাগের তিন ভাগই জল।

(গ) **গ্যাসীয়** অবস্থায় (As Gas)—গ্যাসীয় অবস্থায় জলকে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পাকারে পাওয়া যায়।

জলের উৎস ও ইহার আবর্ত্তন (Sources of water and water cycle) ঃ—প্রকৃতিতে জলকে যে অবস্থায় আমরা দেখিতে পাইনা কেন এবং যে উপায়েই উহাকে সংগ্রহ করা হউক না কেন (ভূপৃষ্ঠস্থ প্রাকৃতিক জলের মধ্যে বৃষ্টিজল, প্রস্রবণজল, নদীজল ও সমুদ্রজল উল্লেখযোগ্য ; ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক জলের মধ্যে পুষ্করিণী জল, পাতকূয়ার জল ও নলকূপের জল উল্লেখযোগ্য), **সমুদ্রই ইহার প্রধান উৎস**। এই সমুদ্র সমগ্র পৃথিবীর প্রায় $\frac{3}{4}$ অংশ স্থান ব্যাপিয়া আছে। প্রখর সূর্য্যকিরণে সমুদ্রের জল নিরন্তর বাষ্পে পরিণত হয়। বায়ুর সহিত সেই জলীয় বাষ্প ঊর্দ্ধে নীত হইয়া মেঘ সৃষ্টি করে। উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের অত্যধিক শৈত্যে মেঘ তথায় তুষারে পরিণত হয় এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্থানে অল্প শৈত্যে উহা বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। পর্ব্বতগাত্র সংলগ্ন তুষারও সূর্য্যাতাপে বিগলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে নামিয়া আসে। বরফগলা জল ও বৃষ্টির কতকাংশ নদনদীরূপে সমুদ্রে পতিত হয় এবং বৃষ্টির অবশিষ্টাংশ ভূত্বকের মধ্যে প্রবেশ করে। ভূত্বকের মধ্যে যেমন বৃষ্টির জল প্রবেশ করে তেমনি প্রস্রবণাদি হইতে নিঃসৃত হইয়া নদনদীর অঙ্গ পুষ্ট করে। অতএব আমরা লক্ষ্য করিতেছি, সমুদ্র হইতে জল মেঘএ পরিণত হয়, মেঘ তুষার বা বৃষ্টিতে পরিণত হয় এবং বরফগলা জল ও বৃষ্টির জল (হয় ভূপৃষ্ঠের উপর প্রবাহিত হইয়া, না হয় কিছু সময় ভূত্বকের ভিতর প্রবাহিত হইয়া আবার প্রস্রবণরূপে নির্গত হইয়া নদনদীর সহিত মিশে)

নদনদীরূপে সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়। সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া বিভিন্ন উপায়ে জল সমুদ্রে ফিরিয়া আসে এবং ইহাকে **জলের আবর্ত্তন** (Water Cycle) বলে।

জল উত্তম দ্রাবক (Water is a good solvent) :—যাবতীয় তরল পদার্থের মধ্যে জল একটি শ্রেষ্ঠ দ্রাবক *। নানাবিধ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ ইহাতে দ্রবীভূত হয়। চিনি, সোরা, লবণ, তুঁতে, ফট্‌কিরি প্রভৃতি কঠিন পদার্থ জলে দ্রবণীয়। কঠিন পদার্থের বেলায় ইহার দ্রাব্যতা উষ্ণতা বাড়াইলে বাড়ে ও উত্তাপ কমাইলে কমে। কিন্তু গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে। উষ্ণ জল অপেক্ষা ঠাণ্ডা জলে গ্যাসীয় পদার্থ বেশী দ্রবীভূত হইতে পারে। এই কারণে জলের মধ্যে কোন দ্রবীভূত গ্যাস থাকিলে তাপ প্রয়োগে অতি সহজেই উহাকে জল হইতে বিতাড়িত করা যায়। একটি কাচকুপীতে খানিকটা জল রাখিয়া উত্তাপ দাও। জল সামান্য গরম হইলে ফুটিবার আগেই দেখিবে, উহার ভিতর হইতে বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে। এগুলি কিসের বুদ্‌বুদ্‌ ? জলের সহিত যে বাতাসটুকু মিশিয়াছিল, তাপ পাইয়া তাহা বুদ্‌বুদের আকারে বাহির হইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, বাতাস আংশিকভাবে জলে দ্রবণীয়। জলে দ্রবীভূত বাতাসের সাহায্যে জলবাসী প্রাণীর শ্বাসক্রিয়া চলিয়া থাকে। গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় যদিও জলের দ্রাব্যতা তাপ প্রয়োগে কমিয়া যায়, কিন্তু চাপ প্রয়োগে ইহার দ্রাব্যতা বাড়িয়া যায়। সাধারণ অবস্থায় অঙ্গারাম্ল গ্যাস জলে দ্রবণীয়। কিন্তু চাপ বৃদ্ধি করিয়া উহার দ্রাব্যতা যথেষ্ট বাড়ান যায়। অতিরিক্ত চাপে অধিক পরিমাণ অঙ্গারাম্ল গ্যাস জলে দ্রবীভূত করিয়াই বাতান্বিত

* যাহা দ্রবীভূত হয় তাহাকে **দ্রাব** (solute) এবং যে দ্রবীভূত করে তাহাকে **দ্রাবক** (solvent) বলে। ধর, চিনি জলে দ্রবীভূত হইয়াছে। চিনি দ্রাব ও জল দ্রাবক।

জল সোডা, লেমনেড প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুর দ্রাবণের সময় তাপ বাহির হয় (যখন তরল গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড বা কষ্টিক পটাস ইত্যাদি জলে দ্রবীভূত হয়)। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুর দ্রাবণকালে উহা শীতল হইয়া যায় (যখন চিনি, নিশাদল ইত্যাদি জলে দ্রবীভূত হয়)। জল উত্তম দ্রাবক বটে কিন্তু ইহার তাপ ও তড়িৎ পরিবাহিতা শক্তি খুব কম (Water is a bad conductor of heat and electricity)।

জীবজগতে জলের গুরুত্ব (Importance of water to living objects) :—জল ব্যতীত জীবজগতের অস্তিত্ব সম্ভবপর নয় কারণ জীবকোষের (জীবদেহের প্রধান উপাদান হইল জীবকোষ) প্রোটোপ্লাজম্ (ইহাই হইতেছে প্রাণপদার্থ) প্রস্তুতকরণে অন্যান্য উপাদানের সহিত জলেরও প্রয়োজন আছে। আমাদের দেহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জলীয় ভাগ। বীজ হইতে গাছ জন্মিবার জন্য এবং গাছের পুষ্টির জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হয়, তাহার মধ্যে জল অন্যতম। সুতরাং উদ্ভিদ্‌জীবনে জলের দান কত সমধিক, তাহা তোমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছ। প্রায় সকল প্রাণী পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ্ ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণী যথা—গরু, ছাগল, ঘোড়া, হাতী, বানর প্রভৃতি সাক্ষাৎভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। মাংসাশী প্রাণী যথা—ব্যাঘ্র, সিংহ, শৃগাল প্রভৃতি যদিও উদ্ভিদ্ ভক্ষণ করে না কিন্তু ইহাদের ভক্ষ্য প্রাণীসমূহ উদ্ভিদ্‌ভোজী। অতএব দেখা যাইতেছে, মাংসাশী প্রাণিগণও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু জল ব্যতীত উদ্ভিদ্‌জীবন সম্ভব নহে এবং যেহেতু প্রায় সকল প্রাণী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবনধারণের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল সুতরাং এই দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা

স্বীকার করিতে বাধ্য যে, জল ব্যতীত প্রাণিজীবন সম্ভবপর নয়। মানবজীবনে জলের গুরুত্ব আরও বেশী। পান, রান্না, হাতমুখ, বস্ত্রাদি ইত্যাদি ধৌত করিবার জন্য আমরা প্রতিদিন অনেক পরিমাণ জল ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের আবেষ্টনী পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্যও জলের প্রয়োজনীতা আছে।

কড়া ও কোমল জল :—সাধারণতঃ আমরা যে জল ব্যবহার করি তাহাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) **কড়া জল** ও (২) **কোমল জল**।

কোমল জল (Soft water) :—যে সব প্রাকৃতিক জল সাধারণ সাবানের সহিত অতি সহজেই ফেন (lather) উৎপন্ন করে, তাহাকে কোমল জল বলে।

কড়া জল (Hard water) :—যে সব প্রাকৃতিক জল সাধারণ সাবানের সহিত সহজে ফেন উৎপন্ন করে না, তাহাকে কড়া জল বলে। কোমল জল রান্না, পান ও কাপড় কাচা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কড়া জল এই সকল কার্য্যের উপযোগী নয়।

জল কড়া হওয়ার কারণ (Causes of Hardness) :—প্রাকৃতিক জলে অনেক ধাতুর যৌগিক পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। যখন ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম ঘটিত যৌগিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে তখন সেই জল হয় **কড়া** এবং কড়া জলকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—**অস্থায়ী** ও **স্থায়ী** কড়া জল।

অস্থায়ী কড়া (Temporary Hardness) :—ক্যাল্‌সিয়াম বা ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতুর বাই-কার্ব্বনেট অথবা উভয়ই যখন জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, তখন তাহাকে অস্থায়ী কড়া জল বলে। এরূপ কড়া জলকে উত্তপ্ত করিয়া **ফুটাইলে** (by boiling) অথবা প্রয়োজনমত **চূণের জল** (lime water) মিশাইলে দ্রবীভূত

বাই-কার্ব্বনেট অদ্রবণীয় কার্ব্বনেটে পরিবর্ত্তিত হইয়া জল হইতে পৃথক হইয়া পড়ে এবং ফলে জল আর কড়া থাকে না—কোমল হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ সাবান ব্যবহার করিলে সেই জল সহজেই ফেন উৎপাদন করে।

স্থায়ী কড়া (Permanent Hardness) :—ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড বা সাল্‌ফেট যখন জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, তখন তাহাকে স্থায়ী কড়া জল বলে। সেই জলকে উত্তপ্ত করিলে বা তাহাতে চূণের জল মিশাইলে কোমল করা যায় না। **কাপড় কাচিবার সোডা** (sodium carbonate) মিশাইলে ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড বা সাল্‌ফেট রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অদ্রাব্য কঠিন বস্তুরূপে জলের তলায় জমিয়া যায়। তখন সেই জলকে পরিস্রুতি প্রক্রিয়ায় কোমল জলে পরিণত করা যায় অর্থাৎ উহা তখন সাবানের সহিত ফেন উৎপাদন করে।

জল পরিশুদ্ধি (Purification of water) :—পূর্ব্বেই তোমাদের বলিয়াছি, জলের উপাদান দুইটি—উদজান ও অম্লজান। দুইভাগ উদজান ও একভাগ অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে জলের উৎপত্তি হয়। জল বিশুদ্ধ হইলে এই দুইটি উপাদান ছাড়া আর অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা যে সব জল ব্যবহার করি, তাহা বিশুদ্ধ নহে। এই সমস্ত জলে কিছু না কিছু এইরূপ পদার্থ দ্রবীভূত বা ভাসমান অবস্থায় থাকে (জৈব ও অজৈব পদার্থ জলে দ্রবীভূত বা ভাসমান অবস্থায় থাকিতে পারে), যাহা জলের উপাদান উদজান ও অম্লজান হইতে বিভিন্ন। যখন এইরূপ বিজাতীয় কোন পদার্থ জলে থাকে তখন সেই জলকে অশুদ্ধ জল বলে। জল হইতে বিজাতীয় পদার্থ দূরীকরণের নাম জল পরিশুদ্ধি। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে জল পরিশুদ্ধ হইয়া

থাকে। সূর্য্যালোক ও বায়ুস্থিত অম্লজান গ্যাস দ্বারা নদী ও পুষ্করিণীর জল নিয়ত কিছুটা পরিশুদ্ধ হয়। মৎস্যাদি জলের ময়লা, পোকামাকড় ইত্যাদি ভক্ষণ করিয়া জল পরিশুদ্ধির বিষয়ে কিছুটা সাহায্য করে। নদীর স্রোত আবর্জ্জনা, ময়লা ইত্যাদি নিয়ত সমুদ্রে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং তাহার জন্য নদীর জল কিছুটা পরিষ্কৃত হয়। এই সমস্ত স্বাভাবিক উপায় ব্যতীত কৃত্রিম উপায়ে —যেমন আস্রবণ, পরিস্রুতি, পাতন, নির্ব্বীজন ইত্যাদি—জলকে পরিষ্কৃত করা যায়।

[**আস্রবণ** (Decantation)—তরল পদার্থ হইতে ভারী অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থকে থিতাইয়া পৃথকীকরণের প্রণালীকে আস্রবণ বলে। ঘোলা, কাদা মেশান জল বীকারে কিছুক্ষণ রাখিয়া দাও। দেখিবে, পাত্রের তলায় কাদা জমিয়াছে এবং জলটা পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার। এখন পরিষ্কার জলটুকু বীকারকে কাত করিয়া অতি ধীরে ধীরে ঢালিয়া লও এবং লক্ষ্য রাখ, নীচের কাদা কিছুমাত্র জলের সহিত পুনরায় না মিশে। থিতাইয়া এইভাবে কাত করিয়া ঢালিয়া লওয়াকেই আস্রবণ বলে।

১২নং চিত্র—পরিস্রুতি প্রণালীর সাহায্যে মিশ্রিত পদার্থের পৃথকীকরণ
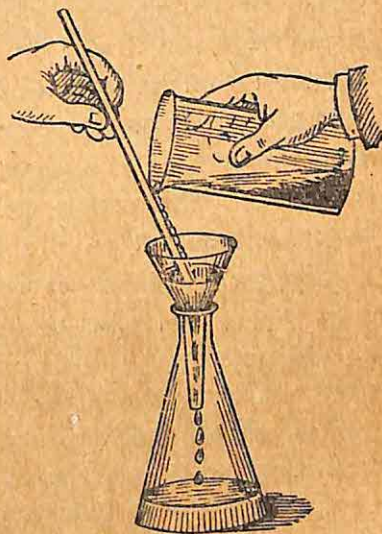
পরিস্রুতি (Filtration)—সচ্ছিদ্র পদার্থের সাহায্যে অপরিষ্কার তরল পদার্থকে ভাসমান অদ্রবণীয় ঘন কঠিন পদার্থ হইতে পৃথক করার প্রণালীকে পরিস্রুতি বলে। ঘোলা কাদা মেশান জল হইতে পরিষ্কৃত জল পাওয়ার জন্য আমরা উহাকে থিতাইয়া আস্রবণ প্রণালীর সাহায্য লইয়াছিলাম। যদি কাদার পরিবর্ত্তে খড়ি মিশান অপরিষ্কৃত জল লওয়া হয় তবে পরিস্রুতি প্রণালীর সাহায্য লইতে হয়, কারণ হালকা খড়িকে থিতাইয়া জল হইতে পৃথক করা যায় না। এক টুকরা ব্লটিং কাগজকে ঠোঙার মত জড়াইয়া উহাকে একটা কাচের ফানেলের উপর বসাও এবং উহার নীচে একটা কাচপাত্র রাখ। এখন খড়ি মিশান অপরিষ্কার জল ঐ কাগজের উপর ঢালিয়া দাও। দেখ, নীচের পাত্রে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া যে জল জমিতেছে

তাহা পরিষ্কার এবং তাহাতে কোন খড়ি নাই। খড়ি ব্লটিং কাগজখানার উপর সঞ্চিত হইয়াছে।

পাতন (Distillation)—স্ফুটনের সাহায্যে তরল পদার্থের দ্রুত বাষ্পে পরিণতি এবং শৈত্যের দ্বারা সেই বাষ্পকে তরল অবস্থায় ফিরাইয়া আনা প্রণালীকে পাতন বলে। একটা বকযন্ত্রের মধ্যে খানিকটা জল লইয়া উহাতে খানিকটা বালি ও তুঁতের গুঁড়া মিশাইয়া দাও। দেখ, তুঁতে জলে দ্রবীভূত হওয়ায় দ্রবের রঙ হইল নীল। কিন্তু অদ্রবণীয় বালি উহাকে ঘোলা করিয়া রাখিয়াছে। এখন বকযন্ত্রের মুখে একটা কাচকুপী (flask) পরাইয়া দিয়া উহাকে শীতল জলের উপর ঠাণ্ডা করিয়া রাখ। বকযন্ত্রে তাপ দাও। কিছু পরে দেখ, জল ফুটিয়া বাষ্প হইতেছে এবং ঠাণ্ডা পাত্রে প্রবেশ করিয়া ঐ বাষ্প আবার জল হইতেছে। পাত্রে যে জল সঞ্চিত হইল পরীক্ষা করিয়া দেখ, উহা বর্ণহীন ও স্বচ্ছ। কাজেই উহাতে তুঁতে বা বালি নাই। উহারা বকযন্ত্রের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। কেবল পরিষ্কার জলটুকু দ্বিতীয় পাত্রে আসিয়া জমিয়াছে। এই উপায়ে তরল বস্তুকে পরিষ্কার করার প্রণালীকে পাতন এবং পরিস্কৃত জলকে পাতিত জল (distilled water) বলা হয়। পাতন প্রণালীতে তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় উভয় প্রকার অনুদ্বায়ী (non-volatile) পদার্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু এই প্রণালীর সাহায্যে উদ্বায়ী (volatile) দ্রবণীয় বা অদ্রবণীয় পদার্থ দূরীভূত করা যায় না।

১৩নং চিত্র—পাতন প্রণালীর সাহায্যে
মিশ্রিত পদার্থের পৃথকীকরণ

নির্ব্বীজন (Sterilisation)—যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া জীবাণুনাশ করা যায় তাহাকে নির্ব্বীজন বলে। স্ফুটন (Boiling method), জারণ (Oxidation method), ক্লোরিণ মিশ্রণ (Cholirination method), বেগুনি পারের আলো (By Ultra-Violet Rays) ইত্যাদির সাহায্যে জীবাণু ধ্বংস করা যায়। অধিক উত্তাপে অধিকাংশ জীবণুই মরিয়া যায়; সুতরাং স্ফুটনের সাহায্যে আমরা অনেক জীবাণু ধ্বংস করিতে পারি। কতকগুলি মৌলিক, মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের (যেমন ওজোন, বায়ু, পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ইত্যাদি) এমন গুণ আছে যে তাহারা জৈব পদার্থগুলিকে (organic substances) জারিত করিতে পারে ও জীবাণু ধ্বংস করিতে পারে। এইগুলি জারণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ক্লোরিণ, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি মৌলিক ও যৌগিক পদার্থগুলির বিভিন্ন জীবাণুর উপর বিষক্রিয়া আছে। তাই জীবাণু ধ্বংসে ইহাদের ব্যবহার করা হয়। জীবাণু ধ্বংসের আধুনিক পদ্ধতি হইল **বেগুনি পারের আলো।** পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেগুনি পারের আলো এক মিনিটের মধ্যে অধিকাংশ জীবাণুই ধ্বংস করিতে পারে।]

পানীয় জল (Drinking water) :—পানীয় জল স্বচ্ছ ও বর্ণহীন হইবে এবং তাহাতে কোন প্রকার জৈব পদার্থ বিশেষতঃ কোন প্রকার রোগ জীবাণু থাকিবে না। পানীয় জলে **অল্প পরিমাণ** কোন কোন দ্রবীভূত ধাতব পদার্থ থাকিলে বিশেষ দোষযুক্ত হয় না। পানীয় জল স্বাদবিহীন না হওয়াই ভাল কারণ ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। সেইজন্য একেবারে বিশুদ্ধ জল পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক জল (যেমন বৃষ্টিজল, নদীজল, প্রস্রবণজল সমুদ্রজল ইত্যাদি) পানীয়রূপে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, কারণ এই সমস্ত জলে ভাসমান অদ্রবণীয় পদার্থ, রোগজীবাণু ও অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত পদার্থ থাকিতে পারে। সাধারণতঃ মনে হয় যে, প্রাকৃতিক জলকে পাতিত করিয়া লইলেই উহাকে অনেকটা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাইবে এবং তাহা পানীয়রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু পাতিত জল স্বাদহীন ; সেইজন্য পানীয় হিসাবে উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। কিঞ্চিৎ পরিমাণে লবণ, একটু অম্লজান ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস দ্রবীভূত থাকে বলিয়া পানীয় জলের স্বাদ ভাল হয়।

নদী ও পুষ্করিণীর জল প্রথমে থিতাইয়া (ভারী অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থগুলি তলায় জমা হইবে ; থিতান ক্রিয়া দ্রুত সাধনের জন্য কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি ব্যবহার করা যাইতে পারে) আস্রবণ করা হয়। তারপর ঐ জল বেশ কিছুক্ষণ ফুটাইয়া (অধিক উত্তাপে অনেক জীবাণুই মরিয়া যায়) বালি ও কাঠকয়লার সাহায্যে পরিস্রুত করিয়া (ভাসমান অদ্রবণীয় পদার্থগুলি ইহাতে বিতাড়িত হয়) পানের উপযুক্ত করা হয় (১৪নং চিত্র দেখ)। অল্প পরিমাণ জল এইভাবে শোধন করা যাইতে পারে, কিন্তু বেশী পরিমাণ জল শোধন করিতে হইলে এই উপায় সম্ভবপর নয়। বড় বড় শহরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা হয়। নিকটস্থ

কোন নদী হইতে পাম্পের সাহায্যে জল উত্তোলন করিয়া প্রথমে কতকগুলি বড় বড় জলাশয়ে রাখা হয়। এখানে জলের ভারী অদ্রবণীয় কঠিন পদার্থগুলি ধীরে ধীরে নীচে থিতাইয়া যায়। এই ক্রিয়া দ্রুত সাধনের জন্য ফট্‌কিরি ব্যবহার করা হয়। এই জলাশয়গুলির পাশেই বড় বড় কতকগুলি পরিস্রুতি-আধার (fiter-beds) থাকে। এই পরিস্রুতি-আধারগুলিতে প্রথমে কয়েক ফুট মোটা কাঁকর ও পাথরের নুড়ি দেওয়া থাকে এবং উহার উপর প্রথমে মোটা বালু এবং তারপর মিহি বালুর স্তর দেওয়া থাকে। জলাশয়গুলিতে থিতান ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত জল পরিস্রুতি-আধারগুলির উপরাংশে আনা হয় এবং জল এই স্তরগুলি ভেদ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।
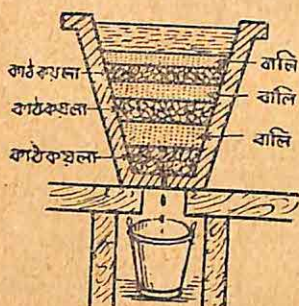
১৪নং চিত্র—পরিস্রুতিপ্রণালীর সাহায্যে ভাসমান অদ্রবণীয় পদার্থগুলির পৃথকীকরণ

তারপর ক্লোরিণ গ্যাস অথবা ওজোন গ্যাস দ্বারা জলকে জীবাণু মুক্ত করা হয়। পাম্পের সাহায্যে এই শোধিত জলকে নিকটস্থ স্থানের বহু উচ্চে অবস্থিত অনেক গুলি জলাধারে প্রেরণ করা হয় এবং সেখান হইতে সমস্ত শহরে জল যোগানো হয়। কলিকাতায় জল সরবরাহের জন্য ২৪ পরগণার উত্তর প্রান্তে পলতা
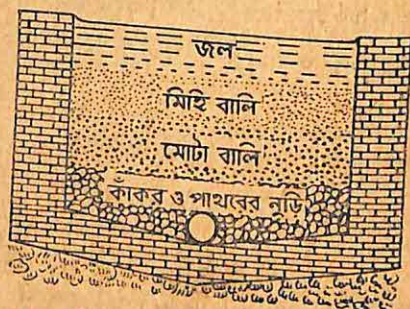
১৫নং চিত্র- শহরে জল পরিশুদ্ধির জন্য পরিস্রুতি-আধার ব্যবস্থা

নামক স্থানে জল পরিস্রুতির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। পরিস্রুত জল পাম্প দ্বারা কলিকাতার উত্তরাংশে টালা নামক স্থানে বহু উচ্চ অবস্থিত অনেকগুলি জলাধারে প্রেরণ করা হয় এবং সেখান হইতে সমস্ত শহরে জল সরবরাহ করা হয়।

ইউরোপের কোন কোন শহরে জীবাণুনাশের জন্য জলাধার-গুলিতে বেগুনি পারের আলো সৃষ্টি করার সরঞ্জাম থাকে এবং অল্পক্ষণের জন্য জলের মধ্যে ঐ রশ্মি সঞ্চারিত করিয়া জীবাণুসমূহ ধ্বংস করা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেগুনি পারের আলোতে এক মিনিটের মধ্যেই অধিকাংশ জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়।

বায়ু ও জলের তুলনা (Comparison between water and air)—বায়ু মিশ্র পদার্থ ; জল যৌগিক পদার্থ। বায়ু গ্যাসীয় ; জল তরল। বায়ুর উপাদানগুলিকে যান্ত্রিক উপায়ে সহজে পৃথক করা যায় ; কিন্তু জলের উপাদান দুইটিকে রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যতীত পৃথক করা যায় না। বায়ুতে উহার উপাদানগুলির পরিমাণ সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট নয় ; কিন্তু জলের উপাদান দুইটির পরিমাণ সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট—দুইভাগ উদজান ও একভাগ অম্লজান। বায়ু ও জল উভয়েই জীবজগতের অত্যাবশ্যক পদার্থ।

বায়ু ও জলের তুলনা

বায়ু	জল
(১) মিশ্র পদার্থ।	(১) যৌগিক পদার্থ।
(২) গ্যাসীয়।	(২) তরল।
(৩) উপাদান—(ক) অম্লজান, (খ) সোরাজান, (গ) অঙ্গারাম্ল (ঘ) জলীয় বাষ্প, (ঙ) অন্যান্য গ্যাসের (inert gases) পরিমাণ অত্যল্প।	(৩) উপাদান—(ক) অম্লজান, (খ) উদজান।
(৪) উপাদানগুলিকে যান্ত্রিক উপায়ে সহজে পৃথক করিতে পারা যায়।	(৪) উপাদান দুইটিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথক করিতে পারা যায়।
(৫) উপাদানগুলির পরিমাণ সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট নয়।	(৫) উপাদান দুইটির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ; দুইভাগ উদজান ও একভাগ অম্লজান।
(৬) ইহাতে প্রাণীর শ্বাসকার্য্যের প্রয়োজনীয় পদার্থ অম্লজান আছে।	(৬) ইহা প্রাণীর অত্যাবশ্যক পদার্থ।

এইবার আমরা বায়ু ও জলের উপাদানগুলির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

অম্লজানের ধর্ম্ম (Properties of Oxygen) :—(১) ইহা বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন গ্যাস। (২) ইহা বায়ু অপেক্ষা ভারী। (৩) এই গ্যাস ব্যতীত শ্বাসকার্য্য সম্ভবপর নহে। (৪) ইহা জলে কিঞ্চিৎ দ্রবণীয়। জলে দ্রবীভূত অম্লজানের সাহায্যে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী বাঁচিয়া থাকে। (৫) ইহা দাহ্য নয় কিন্তু দহনকার্য্যে সাহায্য করে। একটি নির্ব্বাপিত প্রায় পাঁকাটি অম্লজানপূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করাইয়া দাও। দেখিবে, পাঁকাটি এখন উজ্জল শিখাসহ জ্বলিতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, অম্লজান দাহ্য নয় কিন্তু দহনকার্য্যে সহায়তা করে। (৬) ক্ষারীয় পাইরোগেলেট দ্রব (alkaline pyrogallate solution) অম্লজানকে শোষণ করিয়া লয়। (৭) ইহা মৌলিক পদার্থ।

অম্লজানের পরীক্ষা (Tests of Oxygen) :—(১) জ্বলন্ত কাঠি নিবাইয়া রক্তিম অবস্থায় গ্যাসজারে প্রবেশ করাইলে উহা পুনরায় জ্বলিয়া উঠিবে। (২) ইহা ক্ষারীয়পাইরোগেলেট দ্রবে বিশোষিত হয়।

অম্লজানের ব্যবহার (Uses of Oxygen) :—কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনার জন্য, অক্সি-হাইড্রোজেন অগ্নিশিখা আলোকের জন্য তথা নানা ধাতু গলাইবার জন্য, প্রভৃতি নানারূপে ইহার ব্যবহার আছে। তবে সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাওয়ার দরুণ এখন অক্সি-হাইড্রোজেন অগ্নিশিখার ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে।

সোরাজানের ধর্ম্ম (Properties of Nitrogen) :—(১) ইহা বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন গ্যাস। (২) ইহা বায়ু অপেক্ষা সামান্য হাল্‌কা এবং জলে অল্পমাত্রায় দ্রবীভূত হয়। (৩) ইহা নিজে দাহ্য নয় বা দহনক্রিয়ার সহায়তা করে না। ইহার মধ্যে কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। (৪) এই গ্যাস অতিশয় নিষ্ক্রিয় ;

সাধারণতঃ কোন বস্তুর সহিত সহজে সংযুক্ত হয় না। (৫) অত্যধিক চাপে ইহা উদজানের সহিত মিলিয়া অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করে। (৬) অত্যধিক উত্তাপে ইহা ক্যাল্‌সিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থের সহিত মিলিত হয়। (৭) ইহা মৌলিক পদার্থ।

সোরাজানের পরীক্ষা (Tests of Nitrogen):—সোরাজানপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইলে উহা তৎক্ষণাৎ নিবিয়া যাইবে এবং উহা পরিষ্কৃত চূণের জল ঘোলা করিবে না।

সোরাজানের ব্যবহার (Uses of Nitrogen):—অম্লজানের মত ইহা প্রয়োজনীয় না হইলেও জীবদেহের ইহা একটি বিশিষ্ট উপাদান। অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি প্রস্তুতকরণে প্রচুর সোরাজানের প্রয়োজন হয়। বৈদ্যুতিক বাল্‌বের ভিতর এবং গ্যাস থার্ম্মোমিটারে সোরাজান ব্যবহৃত হয়।

অঙ্গারাম্লের ধর্ম্ম (Properties of Carbon dioxide):—(১) ইহা বর্ণহীন ও মৃদু গন্ধযুক্ত গ্যাস এবং ইহার স্বাদ একটু অম্ল। (২) ইহা বায়ু অপেক্ষা ভারী; সেইজন্য অব্যবহার্য্য কূপের মধ্যে অঙ্গারাম্ল গ্যাস জমিয়া থাকিতে দেখা যায়। (৩) ইহা জলে দ্রবণীয়; তোমরা বাজারে যে সোডাওয়াটার দেখিতে পাও, তাহা অঙ্গারাম্ল দ্রবীভূত জল ছাড়া আর কিছুই নয়। (৪) ইহা নিজে দাহ্য নয় বা দহনক্রিয়ার সাহায্য করে না; কিন্তু ম্যাগ্‌নেসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি দুই একটি ধাতু ইহার মধ্যে পুড়িতে পারে এবং তাহার ফলে কার্ব্বন নিষ্কাশিত হয়। ইহা শ্বাসকার্য্যের সহায়ক নহে। (৫) অঙ্গারাম্লের জলীয় দ্রব জলে অদ্রবণীয় খড়ি, মার্ব্বেল, পাথর, ঘুটিং প্রভৃতি পদার্থকে দ্রবীভূত করিয়া থাকে। (৬) অঙ্গারাম্ল পরিষ্কৃত চূণের জলকে ঘোলা করে। (৭) ইহা যৌগিক পদার্থ; ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে

অঙ্গার ও অম্লজান পাওয়া যায়। (৮) একটি ডিসে টারপেনটাইন তৈল জ্বালাইয়া দাও। এখন অঙ্গারাম্ল গ্যাসজার হইতে গ্যাস উহার উপর ঢালিয়া দাও। দেখিবে, আগুণ নিবিয়া গেল। সেইজন্য ইহা অগ্নি-নির্ব্বাপকরূপে ব্যবহৃত হয়।

অঙ্গারাম্লের পরীক্ষা (Tests of Carbon dioxide) :—(১) জ্বলন্ত কাঠি ইহাতে নিবিয়া যায় এবং পরিস্কৃত চূণের জলকে ইহা ঘোলা করে। (২) ইহা কষ্টিক পটাস্, কষ্টিক সোডা, চূণের জল ইত্যাদি দ্বারা বিশোষিত হয়।

অঙ্গারাম্লের ব্যবহার (Uses of Carbon dioxide) :— অঙ্গারাম্ল গ্যাস সোডাওয়াটার, কাপড় কাচা সাবান ইত্যাদি প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হয়। অগ্নি-নির্ব্বাপক হিসাবে ইহার ব্যবহার আছে। ইহাকে জমাইয়া ড্রাই-আইস (dry-ice) প্রস্তুত করা হয়।

উদজানের ধর্ম্ম (Properties of Hydrogen) :—(১) ইহা বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন গ্যাস। (২) ইহা জলে দ্রবীভূত হয় না। (৩) ইহা একটি মৌলিক পদার্থ। (৪) ইহা নিজে দাহ্য কিন্তু দহন ক্রিয়ার সহায়তা করে না।

১৬নং চিত্র—উদজান গ্যাসের ধর্ম পরীক্ষা
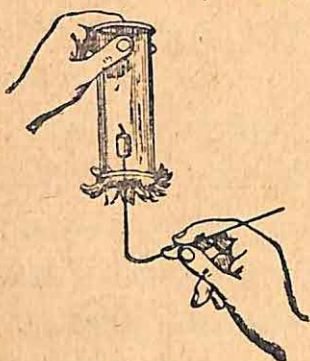
একটা কাঠির মাথায় আগুন ধরাও এবং উহাকে একটা জারের ঢাকা খুলিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দাও। দেখ, কাঠিটা নিবিয়া গেল কিন্তু উদজান নীলবর্ণ শিখা উৎপন্ন করিয়া জ্বলিতে লাগিল (১৬নং চিত্র দেখ)। ইহাতে বুঝা গেল যে, উদজান অন্য বস্তুকে পোড়াইতে পারে না, কিন্তু নিজে পুড়িতে পারে। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখ, ঐ জারের গায়ে ঘামের মত বিন্দু বিন্দু জল জমিয়াছে।

এই জল কোথা হইতে আসিল ? উদজান পুড়িবার সময় বাতাসের অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া এই জল উৎপন্ন করিয়াছে। কাজেই উদজান হইল জলের একটা উপাদান। লাভয়সিয়ে ইহার নাম রাখিয়াছেন **হাইড্রোজেন**। (৫) খানিকটা উদজান দ্বারা একটা রবার-বেলুন পূর্ণ কর এবং উহাতে সূতা বাঁধিয়া ছাড়িয়া দাও। দেখিবে, উহা বাতাসের উপর উড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং উদজান বাতাস অপেক্ষা লঘু। কেবল বাতাস অপেক্ষা লঘু নয়, পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, **উদজান প্রায় পৃথিবীর অধিকাংশ জড় পদার্থ অপেক্ষা লঘু।**

উদজানের পরীক্ষা (Tests of Hydrogen) :—(১) উদজানপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইলে কাঠিটি নিবিয়া যাইবে কিন্তু গ্যাস জ্বলিয়া উঠিবে। (২) এই গ্যাস বেলুনের মধ্যে পূরিলে উহা বাতাসে উড়িতে আরম্ভ করিবে। (৩) এই গ্যাস প্যালাডিয়াম (Palladium) ধাতু দ্বারা বিশোষিত হয়।

উদজানের ব্যবহার (Uses of Hydrogen) :—(১) বেলুন, উড়োজাহাজ প্রভৃতি উড়াইতে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। (২) অ্যামোনিয়া, ভেজিটেবিল ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহার চলন আছে। (৩) খুব উত্তাপবিশিষ্ট আগুনের প্রয়োজন হইলে ইহার সাহায্য লওয়া হয়।

অনুশীলন

১। জলকে উত্তম দ্রাবক কেন বলা হয় ?

২। কড়া ও কোমল জল কাহাকে বলে ? জল কড়া হওয়ার কারণ কি ? কড়া জলকে কোমল করিবার উপায়গুলি বর্ণনা কর।

৩। বড় বড় শহরে জল পরিশুদ্ধির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হয় ?

৪। অম্লজান, উদজান, সোরাজান ও অঙ্গারাম্লের ধর্ম্মগুলি বর্ণনা কর।

অম্লজান, সোরাজান, অঙ্গারাম্ল ও উদজান গ্যাসের তুলনামূলক আলোচনা

(Comparative Study of Oxygen, Nitrogen, Carbon dioxide & Hydrogen)

	অম্লজান	সোরাজান	অঙ্গারাম্ল	উদজান
১। ধর্ম—Properties (ক) বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ ও জলে দ্রবণীয় কিনা।	বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন গ্যাস ও জলে ঈষৎ পরিমাণে দ্রবণীয়।	বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন গ্যাস ও জলে ঈষৎ পরিমাণে দ্রবণীয়।	বর্ণহীন, ঈষৎ অম্লস্বাদযুক্ত, মৃদু গন্ধযুক্ত গ্যাস ও জলে দ্রবণীয়।	বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন গ্যাস ও জলে সামান্য দ্রবণীয়।
(খ) মৌলিক না যৌগিক পদার্থ।	মৌলিক পদার্থ।	মৌলিক পদার্থ।	যৌগিক পদার্থ।	মৌলিক পদার্থ।
(গ) বায়ুর তুলনায় ভার।	বায়ু হইতে ভারী।	বায়ু হইতে লঘু।	বায়ু হইতে বেশ ভারী।	প্রায় সর্ব্বপ্রকার গ্যাস অপেক্ষা হাল্কা।
(ঘ) দহনে সাহায্য করে বা নিজে দাহ্য কিনা।	সকল দহনকার্য্যে সাহায্য করে কিন্তু নিজে দাহ্য নহে।	দহনকার্য্যে সহায়ক নহে ও নিজে দাহ্য পদার্থ নহে।	দহন কার্য্যে সহায়ক নহে ও নিজে দাহ্য পদার্থ নহে।	দহনকার্য্যে সহায়ক নহে কিন্তু নিজে দাহ্য পদার্থ।
(ঙ) শ্বাসকার্য্যের সহায়ক কিনা।	শ্বাসকার্য্যের সহায়ক।	শ্বাসকার্য্যের গৌণ সহায়ক।	শ্বাসকার্য্যের সহায়ক নহে।	শ্বাসকার্য্যের সহায়ক নহে]
২। পরীক্ষা-Tests (ক) নির্ব্বাপিত কাঠি সংস্পর্শের পরিণতি	দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।	একেবারে নিবিয়া যায়।	একেবারে নিবিয়া যায়।	নিজেই জ্বলিয়া উঠে।
(খ) পরিষ্কার চূণের জলের সংস্পর্শে পরিণতি	কোন ক্রিয়া নাই।	কোন ক্রিয়া নাই।	ইহাকে ঘোলা করে।	কোন ক্রিয়া নাই।
৩। ব্যবহার Uses	কৃত্রিম শ্বাস পরিচালনার সহায়ক। ধাতু জুড়িবার ও গলাইবার জন্য অম্লজান, এসিটিলিন (acetylene) বা উদজান গ্যাসের সহিত ব্যবহৃত হয়।	মাটির উর্ব্বরতার জন্য সোরাজান ঘটিত দ্রব্য আবশ্যক। নাইট্রিক অ্যাসিড ও এ্যামোনিয়া এই গ্যাস সাহায্যে প্রস্তুত হয়।	সোডা, লেমনেড ও বরফ প্রস্তুত করিতে ও অগ্নি-নির্ব্বাপক কার্য্যে ও কৃত্রিম উপায়ে কোন বস্তুর উষ্ণতা কমাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।	বেলুন, এরোপ্লেন, ভেজিটেবল ঘৃত ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। খুব উত্তাপবিশিষ্ট আগুনের প্রয়োজন হইলে ইহার সাহায্য লওয়া হয়।

বাষ্পীভবন; আদ্র'তা; বায়ুর জলীয় বাষ্পের উপর শৈত্যেব প্রভাব—শিশির, কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি ও তুষার

আমরা জড় পদার্থকে তিন রকম অবস্থায় দেখিতে পাই :—(১) **কঠিন** (Solid), (২) **তরল** (Liquid) ও (৩) **গ্যাসীয়** (Gaseous)। উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা একই জড় পদার্থ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় এই তিন অবস্থায় থাকিতে পারে। কঠিন বরফকে উত্তাপের সাহায্যে তরল জলে পরিণত করা যায়; আবার জলীয় বাষ্পকে শৈত্যের দ্বারা অর্থাৎ তাপ-হ্রাস দ্বারা তরল জলে এবং অধিকতর শৈত্যের দ্বারা অর্থাৎ অধিকতর তাপ-হ্রাস দ্বারা কঠিন বরফে পরিণত করা যায়। যদিও বহু জড় পদার্থকে উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা তিনটি বিভিন্ন অবস্থায় আনা সম্ভবপর কিন্তু ইহা সকল জড় পদার্থের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নহে। যেমন কঠিন কর্পূর, আয়োডিন ইত্যাদি তাপযোগে তরল অবস্থার ভিতর দিয়া না গিয়া সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়। তরল পদার্থের বাষ্পে পরিণত হওয়াকে **বাষ্পীকরণ** (Vapourisation) এবং বাষ্প হইতে তরলে পরিণত হওয়াকে **ঘনীভবন** (Condensation) বলে। দুইটি বিভিন্ন উপায়ে তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয় :—(১) **বাষ্পীভবন** (Evaporation) ও (২) **স্ফুটন** (Boiling)। যে কোন তাপমাত্রায় তরলের উপরিভাগ হইতে ধীরে ধীরে তরলের বাষ্পে পরিণতিকে বাষ্পীভবন বলে। একটি পাত্রে তরল পদার্থ, যেমন জল রাখিয়া দাও এবং দুই একদিন পরে পরীক্ষা করিয়া দেখ, পাত্রে আর জল নাই। ইহার কারণ বাষ্পীভবন ক্রিয়া। বাষ্পীভবন যদিও সাধারণ তাপমাত্রাতেই হয় কিন্তু তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা বাড়িয়া যায় এবং তরল পদার্থের উষ্ণতাও বাড়িতে

থাকে। তাপ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছান যায় যখন তরল পদার্থের সকল অংশ হইতে বাষ্পীভবন দ্রুতগতিতে হইতে থাকে এবং তরল পদার্থের উষ্ণতা আর বাড়ে না। তরল পদার্থের এই অবস্থাকে স্ফুটন বলে এবং নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রা বা উষ্ণতাকে তরল পদার্থের **স্ফুটনাঙ্ক** (boiling point) বলে। বাষ্পীভবন ও স্ফুটনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বাষ্পীভবন তরল পদার্থের উপরিভাগ হইতে ধীরে ধীরে যে কোন তাপমাত্রায় হইতে পারে কিন্তু স্ফুটন তরল পদার্থের সকল অংশ হইতে নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রায় হইয়া থাকে এবং যতক্ষণ এই ক্রিয়া চলে ততক্ষণ ইহার তাপমাত্রার কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

বায়ুতে জলীয় বাষ্প (Water vapour in air) :—বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প আছে, তাহা তোমরা বায়ুর উপাদানগুলির আলোচনা-কালে লক্ষ্য করিয়াছ। সমুদ্র, নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ের উপরিভাগ হইতে সর্ব্বদা সকল অবস্থায় জল কম বেশী বাষ্পীভবন ক্রিয়ার দরুণ বাষ্পে পরিণত হইতেছে। বায়ু গ্যাসীয় পদার্থ ; উহা সচ্ছিদ্র এবং সেই ছিদ্রের মধ্যে জলীয় বাষ্প থাকে। একটা বাটিতে কিছু জল লইয়া খানিকটা চিনি দিয়া নাড়িয়া দাও। উহা জলে গলিয়া গেলে আরও খানিকটা চিনি দিয়া নাড়িয়া দাও। বারবার এইরূপ করিলে দেখিবে, চিনি আর জলে গলিতেছে না এবং খানিকটা চিনি বাটির তলায় জমিয়া গেল। কারণ ঐ জলটুকু এই অবস্থায় আর বেশী চিনি জলে দ্রবীভূত করিতে পারে না। এখন বাটির জল গরম কর ; দেখিবে বাটির তলায় যে চিনি পড়িয়াছিল তাহা জলে গলিয়া গেল। বাটিটা ঠাণ্ডা করিলে দেখিবে, যে বেশী পরিমাণ চিনি জলে দ্রবীভূত হইয়াছিল তাহা পুনরায় জল হইতে বাহির হইয়া বাটির তলে জমিল। কাজেই দেখা যাইতেছে, জলের উষ্ণতা বাড়াইলে উহার কঠিন জিনিস ধারণ

করিবার ক্ষমতা বাড়ে ও উত্তাপ কমাইলে ঐ ক্ষমতাও কমে। বায়ুর বিষয়েও ঠিক এই নিয়ম খাটে। কোন নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দ্দিষ্ট আয়তনের বায়ু একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে। যে বায়ুতে জলীয় বাষ্প পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং যাহা আর বেশী জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে না, তাহাকে **সম্পৃক্ত** (saturated) বায়ু বলে। যে বায়ুতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কম জলীয় বাষ্প থাকে, তাহাকে **অসম্পৃক্ত** (un-saturated) বায়ু বলে। ৪০° ডিগ্রী উত্তাপে যদি কোন বাতাস সম্পৃক্ত থাকে, ৬০° ডিগ্রী উত্তাপে উহা অসম্পৃক্ত কারণ ঐ উত্তাপে উহা আরও বেশী বাষ্প ধারণ করিতে পারে। আবার ৪০° ডিগ্রী উত্তাপে সম্পৃক্ত বাতাসকে যদি ৩০° ডিগ্রীতে আনা হয়, তাহা হইলে উহা আর অতখানি বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। তাহার ফলে খানিকটা বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হইবে। ৪০° ডিগ্রী উত্তাপে অসম্পৃক্ত বাতাসকে যদি ধীরে ধীরে শীতল করা যায়, তবে এমন একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় পৌঁছান যায় যখন ঐ পরিমাণ জলীয় বাষ্প বাতাসকে সম্পৃক্ত করে। এই উষ্ণতাকে **শিশিরাঙ্ক** (Dew point) বলে। যদি বলা হয়, শিশিরাঙ্ক ২৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্, তবে বুঝিতে হইবে বায়ুর উষ্ণতা ২৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী আছে এবং যদি সেই বায়ুকে শীতল করিয়া ২৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে আনা হয়, তবে বায়ুতে বর্ত্তমান জলীয় বাষ্প ঐ বায়ুকে ২৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে সম্পৃক্ত করিবে।

বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity) :—আর্দ্রতা আমাদিগকে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বলিয়া দেয়। সাধারণতঃ বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকিলে উহাকে শুষ্ক এবং বেশী থাকিলে সিক্ত বলা হয়। অবশ্য বাতাসের এই 'শুষ্কতা' বা 'সিক্ততা' গুণ অনেকাংশে নির্ভর করে বাতাসের চাপ ও উষ্ণতার উপর।

বাতাসের আর্দ্রতা আমরা দুইভাবে প্রকাশ করিতে পারি—(১) বাতাসের চরম আর্দ্রতা দ্বারা (Absolute humidity) ও (২) বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা দ্বারা (Relative humidity)।

চরম আর্দ্রতা :—একটি নির্দ্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকে তাহাকে বায়ুর চরম আর্দ্রতা বলে। সাধারণতঃ ইহার পরিমাণ প্রতি ঘন মিটারে গ্রামের সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত হয়। ধর, যদি বলা হয় বাতাসের চরম আর্দ্রতা ৮ গ্রাম/কিউবিক মিটার, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এক ঘন মিটার বায়ুতে ৮ গ্রাম জলীয় বাষ্প আছে।

আপেক্ষিক আর্দ্রতা :—যে কোন উষ্ণতায় নির্দ্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে তাহার ভরের সহিত সেই উষ্ণতায় সেই বায়ুকে সম্পৃক্ত করিবার জন্য যতখানি জলীয় বাষ্প প্রয়োজন তাহার ভরের যে অনুপাত তাহাকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা বায়ুর সম্পৃক্ততার মাত্রা (degree of saturation) নির্ণয় করে। ইহাকে শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়।

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা} = \frac{\text{নির্দ্দিষ্ট আয়তন বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে}}{\text{বায়ুর ঐ উষ্ণতায় সেই আয়তন বায়ুকে সম্পৃক্ত করিতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন}} \times ১০০$$

বাতাসের শুষ্কতা বা সিক্ততা চরম আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে না। উহা আপেক্ষিক আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬০% বলিলে বুঝায় যে, বায়ু সম্পৃক্ত করিতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন আসলে বায়ুতে তাহার ৬০% বা $\frac{৬০}{১০০}$ অংশ আছে।

বায়ুর জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনঃ—

সূর্য্যোত্তাপের দরুণ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান হইতে জল প্রতিনিয়ত অদৃশ্য জলীয় বাষ্পে পরিণত হইয়া বাতাসে মিশিয়া যাইতেছে। বিভিন্ন কারণে ও অবস্থায় বায়ু শীতল হইলে ঐ জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন হয় এবং ফলে শিশির, কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদির উৎপত্তি হয়।

শিশির (Dew) :—হেমন্ত ও শীতের প্রভাতে তোমরা দেখিতে পাও, ঘাস ও গাছের পাতা সিক্ত। ঘাসের পাতার মাথায় জলবিন্দুগুলি রৌদ্রের আলোকে মুক্তার মত ঝক্‌মক্ করে। বড় বড় কলাপাতা হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল মাটিতে পড়িতে থাকে। এই জলকে **শিশির** বলে। ইহা কোথা হইতে আসে জান? ইহা বাতাসের জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের ফল। দিনের বেলায় সূর্য্যের উত্তাপের জন্য বাতাসে জলীয় বাষ্প অসম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে। রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠের সমস্ত বস্তু তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হইতে থাকে (দিনের বেলায় ভূপৃষ্ঠের সমস্ত বস্তু সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া থাকে)। পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু শীতল হইতে হইতে যখন শিশিরাঙ্কে নামে তখন ঐ বায়ু উহাতে বর্ত্তমান জলীয় বাষ্পের দ্বারা সম্পৃক্ত হইয়া পড়ে। ইহার পরও উষ্ণতা কমিলে অতিরিক্ত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশির আকারে ভূপৃষ্ঠের শীতল বস্তুর গায়ে জমে। প্রভাতে রৌদ্র উঠিলে বাতাস ও ঐ সকল বস্তু পুনরায় উষ্ণ হয় এবং তাহাদের উপর সঞ্চিত শিশির-জল আবার বাষ্প হইয়া বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া যায়। শীতের রাত্রে ঘরের বাহিরে শুষ্ক কাপড় রাখিলেও তাহা ভিজিয়া যায়। যে সকল জিনিস যত শীঘ্র তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হয়, তাহাদের উপর তত বেশী শিশির জমিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়ে। সেখানে শিশিরের জল জমিয়া তুষারে পরিণত হয়।

শীতের রাত্রে মেঘলা করিলে শিশির জন্মে না, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিও। মেঘ ভূমির তাপ বিকিরণে বাধা দেয়। সেইজন্য বাতাস ও অন্যান্য বস্তু যথেষ্ট শীতল হইতে পারে না বলিয়া শিশিরও জমে না। আবার দেখিও বাতাস যদি স্থির না থাকে, অবিরত বহিতে থাকে, তাহা হইলেও শিশির জন্মে না। গ্রীষ্মকালের রাত্রে বাতাস ও অন্যান্য বস্তু যথেষ্ট শীতল হইতে পারে না বলিয়াই শিশির জমে না।

কুয়াশা (Fog) :— অনেক সময় হেমন্ত ও শীতের প্রভাতে তোমরা দেখিতে পাও, চারিদিকের বাতাস যেন একটা সাদা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, অতি নিকটের জিনিসও স্পষ্টভাবে দেখা যায় না; ইহাকে **কুয়াশা** বলে। বেলা যতই বাড়িতে থাকে, রৌদ্রের উত্তাপ বাড়ে এবং তাহার ফলে কুয়াশা কাটিয়া গিয়া দিক্ সকল আবার পরিষ্কার হয়। এবার কুয়াশা কিরূপে ঘটিয়া থাকে, দেখা যাক। রাত্রিতে তাপ বিকিরণ করিয়া যদি ভূপৃষ্ঠ এমন শীতল অবস্থায় আসে যে ইহার নিকটবর্ত্তী সমগ্র বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা শিশিরাঙ্কের নীচে নামিয়া যায়, তবে বায়ুমণ্ডলের অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প বায়ুতে ভাসমান অগণিত ধূলিকণায়, কয়লার কণার ইত্যাদিতে জমিয়া কুয়াশার সৃষ্টি করে। বায়ুপ্রবাহ থাকিলে কুয়াশা সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে। খুব ঘন কুয়াশাকে **কুজ্ঝটিকা** বলে। প্রভাতের পর সূর্য্যতাপ প্রখর হইলে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুতে অদৃশ্য হইয়া যায়।

মেঘ ও বৃষ্টি (Cloud and Rain) :—দিবাভাগে রৌদ্রের উত্তাপে মাটি গরম হয়। সেই গরম মাটির সংস্পর্শে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়। তাহার ফলে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তর হালকা হইয়া উপরে দিকে উঠে এবং পার্শ্বস্থ শীতল ও ভারী বাতাস ছুটিয়া আসিয়া ঐ স্থান পূরণ করে।

উপরে ঐ বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া এবং উর্দ্ধে
চাপ হ্রাসের দরুণ সম্প্রসারিত হইয়া শীতল হইতে হইতে শিশি-
রাঙ্কের নীচে নামিয়া যায়। তখন অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প উপরি-
স্তরের বায়ুতে ভাসমান অগণিত ধুলিকণার উপরে জমিয়া মেঘ সৃষ্টি
করে। মেঘের জলকণাগুলি অতি ক্ষুদ্র। সেইজন্য বাতাসের
উর্দ্ধগতির বলে তাহারা নীচের দিতে পড়ে না। কিন্তু এই জল-
বিন্দুগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে ক্রমশঃ আকারে বড় হয় এবং তখন
বায়ু আর উহাদিগকে ভাসাইয়া রাখিতে পারে না। এই অবস্থায়
উহারা বৃষ্টির আকারে ভূতলে নামিয়া আসে।

উহারা বৃষ্টির আকারে ভূতলে নামিয়া আসে। সেখানকার উত্তাপ যদি ৩২° ডিগ্রী ফারেনহাইট্
[বায়ুমণ্ডলের যেখানে বৃষ্টিবিন্দু জমিতেছে, সেখানকার উত্তাপ যদি ৩২° ডিগ্রী ফারেনহাইট্
বা ০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নীচে হয়, তাহা হইলে বিন্দুগুলি আরও জমিয়া কঠিন শিলায়
পরিণত হয়। এই সকল শিলা যে বাতাস ভেদ করিয়া নীচে নামে, তাহার উত্তাপ যদি ৩২° ডিগ্রী
ফারেনহাইটের বা ০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী না হয় তাহা হইলে শিলাবৃষ্টি ভূতলে নামিয়া আসে।
উত্তাপ ৩২° ডিগ্রী ফারেনহাইটের বেশী হইলে শিলাগুলি আবার গলিয়া জল হইয়া যায়।]

তুষার (Snow) :—বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধস্তরের বাতাসের মধ্যে
এমন স্থান আছে যেখানে জল বাষ্পাকারে থাকিতে পারে না
কারণ উত্তাপ ০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ বা ৩২° ডিগ্রী ফারেনহাইটের
কম থাকে [জলের হিমাঙ্ক (freezing point) ০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্
বা ৩২° ডিগ্রী ফারেনহাইট্]। তখন জলীয় বাষ্প স্ফটিকের
আকারে জমিয়া ভূপৃষ্ঠে সোজাসুজি তুষাররূপে পড়িতে থাকে। যে
সমস্ত উচ্চ পর্ব্বতের চূড়া সেইরূপ বায়ুমণ্ডলের স্তরে পৌঁছায়
তাহাদের মাথার উপর তুষার জমে। সেইজন্য হিমালয় পর্ব্বতের
উপরিভাগ তুষারে আবৃত।

অনুশীলন

১। বায়ুর আর্দ্রতা বলিতে কি বুঝ? শিশিরাঙ্ক ও আপেক্ষিক আর্দ্রতার
মধ্যে তফাৎ বুঝাইয়া দাও।

২। বায়ুর জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে কি কি নৈসর্গিক ব্যাপার ঘটে
তাহা বর্ণনা কর।

শক্তি ; ইহার উৎস, প্রকারভেদ ও রূপান্তর ; সজীব যন্ত্রের সহিত জড় যন্ত্রের তুলনা

আমরা পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্) বহির্জগতের অস্তিত্ব অনুভব করি। এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, ইহার মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি—একটি **পদার্থ** ও আর একটি **শক্তি**। কাঠ, কয়লা, পাথর, মাটি, জল, বায়ু, বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, ধাতুদ্রব্য, খনিজদ্রব্য, কীট, পতঙ্গ, ঝিনুক, শামুক, পশু, পক্ষী, মৎস্য, তৃণ, লতা, বৃক্ষ ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু পদার্থ শ্রেণীভুক্ত। পদার্থকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়—**চেতন** ও **জড়**। যাহাদের প্রাণ আছে তাহারা চেতন—যথা পশু, পক্ষী, গাছপালা ইত্যাদি চেতন পদার্থ। যাহাদের প্রাণ নাই তাহারা জড়—যথা, ইট, কাঠ, কয়লা, জল, বায়ু, বই, খাতা, কলম ইত্যাদি জড় পদার্থ। **শক্তি কি?** শক্তি সাধারণতঃ পদার্থের মধ্যে কর্ম্মের প্রেরণা যোগায়। একটি বল স্থির হইয়া আছে। আমরা একটি পদার্থ দেখিতেছি। পা দিয়া বলটিতে ধাক্কা দিলাম, বলটি চলিতে লাগিল। এই চলন্ত বলে পদার্থ সেই একই আছে কিন্তু এখন উহার মধ্যে গতি শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। ইহা এখন কাজ করিতে পারে। কাঠের উপর বন্দুকের গুলি ছোড়া হইল। গতিশীল গুলিটার শক্তি আছে। তাহা দ্বারা সে কাজ করিল, কাঠের আঁইসগুলিকে সরাইয়া দিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাতাস বহিতেছে। প্রবাহমান বাতাসের শক্তি আছে, তাহা দ্বারা উহা নৌকার পালে চাপ দিল ; ফলে নৌকা জলের বাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, **কাজ**

করিবার ক্ষমতার নাম শক্তি। সাধারণতঃ আমরা পদার্থের সহযোগে শক্তির অস্থিত্ব অনুভব করি। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম আছে। সূর্য্য হইতে আমরা যে তাপ ও আলোক পাই, তাহাতে পদার্থের কোন সংস্পর্শ নাই। অথচ তাপ, আলোক বিভিন্ন প্রকার শক্তি। বেতারবার্ত্তায় যে তাড়িত শক্তির ব্যবহার হয় তাহাতেও পদার্থের কোন সংস্পর্শ নাই। অথচ তড়িৎ এক প্রকার শক্তি। তাপ, আলোক, তড়িৎকে কেন শক্তি বলিলাম তাহা পরে আলোচনা করিব।

শক্তির প্রকারভেদ (Different Kinds of Energy) :—শক্তি নানাপ্রকারে প্রকাশ পায়। মোটামুটি আমরা শক্তির সাতটি বিভিন্নরূপ দেখিতে পাই :—(১) যান্ত্রিক শক্তি, (২) তাপ শক্তি, (৩) আলোক শক্তি, (৪) শব্দ শক্তি, (৫) তাড়িত শক্তি, (৬) চৌম্বক শক্তি ও (৭) রাসায়নিক শক্তি।

যান্ত্রিক শক্তি (Mechanical energy) :—যান্ত্রিক শক্তি দুই প্রকারের : গতিমূলক ও স্থৈতিক। সচল অবস্থায় বস্তুর কার্য্য করিবার ক্ষমতাকে **গতিশক্তি** (kinetic energy) বলে। উপরিল্লিখিত বন্দুকের গতিশীল গুলি, প্রবাহমান বাতাস ইত্যাদি গতিশক্তির দৃষ্টান্ত। কোন বস্তুর বিশেষ স্থানে স্থিতির জন্য বা বস্তুর বিভিন্ন অংশের অবস্থানের জন্য কার্য্য করিবার ক্ষমতাকে **স্থৈতিক শক্তি** বলে। ঘড়িতে দম দেওয়া হইল অর্থাৎ চাবি ঘুরাইয়া ঘড়ির স্প্রিং গুটাইয়া ছোট করিয়া দেওয়া হইল। স্বাভাবিক অবস্থায় স্প্রিংএর যে অবস্থান, গুটান অবস্থায় আপেক্ষিকভাবে সেই অবস্থানের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এইজন্যই স্প্রিং কার্য্য করিবার সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি লাভ করিয়াছে। এই শক্তির সাহায্যে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিতেছে। ধনুকের ছিলা টানিয়া ধরিয়াছ। স্বাভাবিক অবস্থায় ধনুকের ছিলার যে অবস্থান,

টানিয়া ধরার দরুণ সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং সেইজন্য ঐ ছিলা কার্য্য করিবার সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি লাভ করিয়াছে। এই শক্তির সাহায্যে ছিলা ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাণ ছুটিয়া চলিবে। সাধারণতঃ পৃথিবীপৃষ্ঠকে বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থান ধরা হয়। যদি কোন বস্তু পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে উপরে থাকে (ধর, একটি ইট ছাদের উপরে আছে) তাহা হইলে ঐ অবস্থানের দরুণ বস্তুটি কার্য্য করিবার সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি লাভ করিবে। ঘড়ির স্প্রিং, ধনুকের ছিলা, ছাদের উপর ইট ইত্যাদি স্থৈতিক শক্তির দৃষ্টান্ত।

তাপ শক্তি (Heat energy) :—তাপে জল বাষ্প হয়। বাষ্পের চাপে ইঞ্জিনের চাকা ঘোরে। চাকার এই গতিশক্তি আসে তাপ হইতে। সুতরাং তাপ একপ্রকার শক্তি।

আলোক শক্তি (Light energy) :—প্রকৃতির একটি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম এই যে শক্তির বিনাস নাই, আছে কেবল রূপান্তর। যেহেতু অন্য শক্তি হইতে আমরা আলোক পাই এবং যেহেতু আলোককে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, সেহেতু আলোক এক প্রকার শক্তি। ইলেকট্রিক বাতি যখন জ্বলে, তখন তাড়িত শক্তি আলোক ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। উদজান ও ক্লোরিণের মিশ্রণ সূর্য্যালোকে বিস্ফোরণ পূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। এখানে আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

শব্দ শক্তি (Sound energy) :—বাজি পোড়াইবার সময় সজোরে শব্দ হইলে নিকটস্থ জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া যায় ; সুতরাং শব্দের শক্তি আছে। ইহার প্রভাবে কোন কোন যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। এখানে শব্দশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে। টেলিফোনে যখন আমরা কথা বলি, তখন শব্দশক্তি তাড়িত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

চৌম্বক শক্তি (Magnetic energy) :—চুম্বক লৌহ আকর্ষণ

করে এবং তাহার ফলে নানাপ্রকারের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র কার্য্যকরী হয়। সুতরাং চুম্বকের শক্তি আছে। ইস্পাতের দ্রুত চুম্বকত্ব প্রাপ্তিতে ও হ্রাসে তাপের উদ্ভব হয়। এখানে চৌম্বক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

তাড়িত শক্তি (Electrical energy) :—তড়িতের সাহায্যে ট্রামগাড়ী চলে, পাখা ঘোরে ইত্যাদি। সুতরাং তড়িতের শক্তি আছে। জলের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ প্রেরণ করিলে জল উদজান ও অম্লজানে বিভক্ত হইয়া যায়। এখানে তাড়িত শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

রাসায়নিক শক্তি (Chemical energy) :—কয়লা, কেরোসিন, বাতি প্রভৃতি পদার্থ যখন পোড়ে তখন তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়। এখানে রাসায়নিক শক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

শক্তির রূপান্তর (Transformation of energy) :—প্রকৃতির একটি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম এই যে, শক্তির বিনাস নাই, আছে কেবল রূপান্তর। আপাত দৃষ্টিতে যাহা ধ্বংস বলিয়া মনে হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে রূপান্তর মাত্র। শক্তির প্রকারভেদ আলোচনাকালে বিভিন্ন প্রকারের রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। যখন ঢিল উচ্চস্থান হইতে মাটিতে পড়ে, তখন শব্দ হয় ও পরস্পরের সংঘর্ষে তাপ উৎপন্ন হয়। ঢিলের স্থৈতিক শক্তি গতিশক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয় এবং গতিশক্তি তাপ ও শব্দ শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়। তাড়িত শক্তি একটি সরু তারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিলে তার উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং ক্রমে আলোক বিকিরণ করে। এক্ষেত্রে তাড়িত শক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

সূর্য্যই সকল শক্তির উৎস (Sun is the source of all energy) :—এই যে বিভিন্ন প্রকার শক্তি ও উহাদের রূপান্তরের

কথা বলা হইল, উহাদের সকলের উৎস হইল সূর্য্যের তেজ বা সৌরশক্তি। একদা সূর্য্য হইতেই গ্রহগুলির জন্ম হইয়াছে। পৃথিবী একটি গ্রহ এবং ইহা যখন সূর্য্যের শক্তি লইয়াই সূর্য্য হইতে বাহির হইয়াছে, তখন আমাদের স্বীকার করিতে হইবে, পৃথিবীপৃষ্ঠে সকল প্রকার শক্তির মূলে রহিয়াছে সৌরশক্তি। কয়লাখানা পুড়িতেছে অর্থাৎ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তাপ ও আলোক শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। কয়লার রাসায়নিক শক্তির মূল কোথায়? বহুকাল ধরিয়া অরণ্যের গাছপালা সূর্য্যের আলো ও তাপ শোষণ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উহারা ঘটনাক্রমে মাটি চাপা পড়িয়া চাপ ও উত্তাপের প্রভাবে কয়লায় পরিণত হয়। সৌরশক্তি উহার মধ্যে রাসায়নিক শক্তিরূপে সঞ্চিত হইয়া আছে। কয়লাখানা যখন পোড়ে, তখন উক্ত রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরিত হইয়া তাপ ও আলোক শক্তিতে পরিণত হয়। সেই তাপশক্তি আবার জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া বাষ্পের চাপরূপে যান্ত্রিক স্থৈতিক শক্তিতে পরিণত হইতেছে। সেই যান্ত্রিক স্থৈতিক শক্তি যখন ইঞ্জিনের চাকা ঘুরায়, তখন উহা গতিশক্তিতে পরিণত হয়। ইঞ্জিনের এই গতিশক্তি ডায়নামো যন্ত্রে প্রযুক্ত হইলে উহা তাড়িত শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়। সেই তাড়িত শক্তি আবার বৈদ্যুতিক পাখায় গতিশক্তিতে এবং বৈদ্যুতিক আলোকে আলোক ও তাপ শক্তিতে পরিণত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া উহা লৌহমধ্যে চৌম্বক শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং এখানে দেখা যাইতেছে, সৌরশক্তি হইতে রাসায়নিক, তাপ, স্থৈতিক, গতি, তাড়িত ও চৌম্বক শক্তির উদ্ভব হইতেছে। আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক। সূর্য্যের তাপ-শক্তিতে পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে প্রভূত পরিমাণ জল বাষ্পীভূত হইতেছে। এই বাষ্প বায়ু হইতে লঘুভার বলিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মেঘের

সৃষ্টি করে। উচ্চস্থানে মেঘের স্থৈতিক শক্তি থাকে। মেঘ বৃষ্টিরূপে পৃথিবীপৃষ্ঠে আসিলে মেঘের স্থৈতিক শক্তি বৃষ্টি ও নদনদী জলের গতীয় শক্তিতে পরিণত হয়। জলের এই গতিশক্তি তুর্বিনের চাকা (turbine) ঘুরাইয়া ডায়নামো যন্ত্রে প্রযুক্ত হইলে তাড়িত-শক্তির উদ্ভব হয়। সেই তাড়িত শক্তি আবার বৈদ্যুতিক পাখায় গতিশক্তিতে এবং বৈদ্যুতিক আলোকে আলোক ও তাপ শক্তিতে পরিণত হইয়া থাকে। এখানেও আমরা সৌরশক্তি হইতে বিভিন্ন শক্তির বিকাশ দেখিতেছি।

জীবমাত্রই কার্য্য করিতে পারে। কার্য্যের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা জীব তাপশক্তি হইতে পাইয়া থাকে। জীবদেহে এই তাপশক্তির উদ্ভব হয় সঞ্চিত ও শোষিত খাদ্যবস্তুর দহনের ফলে। অধিকাংশ উদ্ভিদ্ খাদ্যবস্তু তৈয়ারের জন্য সূর্য্যালোকের উপর নির্ভরশীল। প্রাণীরা উদ্ভিদ্‌দেহের অংশগুলি ভোজন করিয়া খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে। অবশ্য মাংসাশী প্রাণীরা অপর প্রাণীর দেহ ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা যে সব প্রাণীর মাংস খায়, তাহাদের রক্তমাংস উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে প্রস্তুত। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, জীবের শক্তির মূলে রহিয়াছে সৌরশক্তি। ধরাতলে যেরূপেই শক্তি প্রকট হউক না কেন, শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে **উহার উৎস সৌরশক্তি।**

সৌরশক্তির উৎস (Source of Sun's Energy) :—সূর্য্য হইতে নিরন্তর যে প্রভূত পরিমাণ উত্তাপ ও আলোক শক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, যাহার এক অতি ক্ষুদ্র অংশ কাজে লাগাইয়াই পৃথিবীর বহু কাজ সংঘটিত হইতেছে, সেই শক্তির উৎস কোথায় ? পরমাণুর আভ্যন্তরীণ সংঘটন সম্বন্ধে গত ৫০ বৎসরের গবেষণার ফলে পরমাণু কোষের মধ্যে এক বিরাট তেজের উৎসের সন্ধান মিলিয়াছে। আঘাত-সংঘাতে পরমাণু-কোষ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেলে

অনেক সময় এ লুকান তেজের কিছু অংশ মুক্ত হইয়া বাহিরে আসে। বিশাল সূর্য্য হইতে অনুক্ষণ আলোর ও তাপের রূপ লইয়া যে অজস্র তেজ বাহিরে আসিতেছে, তার উৎসের সন্ধান মিলিয়াছে **ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কতকগুলি পরমাণু-কোষের পরস্পরের আঘাত-সংঘাত এবং ভাঙ্গা-চোরার মধ্যে**। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক **আইনষ্টাইন** পরমাণু-কোষের ভাঙ্গা-চোরার ফলে জড়ের বিলোপ হইলে কত প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে তাহা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনিই জড় ও তেজের পরস্পর রূপান্তর সম্ভব তাহা প্রথম প্রচার করেন।

জলশক্তি (Water Power) :—অবস্থানের দরুণ জলের স্থৈতিক শক্তি থাকে এবং প্রবাহের দরুণ ইহার গতিশক্তি থাকে। জলের এই দুইপ্রকার শক্তিকে উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা বহুবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত করা যায়। ১৭ ও ১৮নং চিত্রে দেখান হইয়াছে কিরূপে জলের স্থৈতিক শক্তি ও গতিশক্তি জলতুর্বিনকে আবর্ত্তিত করে। প্রথমে জলের স্থৈতিক শক্তি লইয়া আলোচনা করা যাক। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুণ জলপ্রপাতগুলি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে এবং শীতকালে বৃষ্টিপাতের অভাবে ইহারা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। যাহাতে সব সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ জল সরবরাহ থাকে, সেইজন্য উপরিস্তরে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার
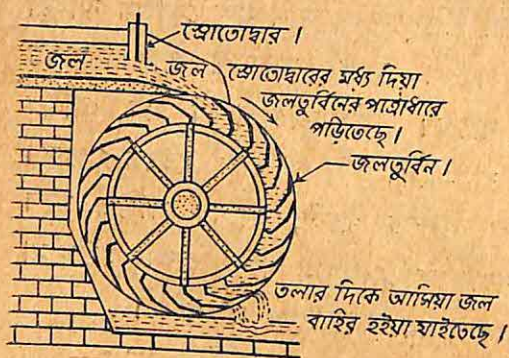
১৭নং চিত্র—স্রোতোদ্বার হইতে নির্গত জলের স্থৈতিক শক্তির জন্য জলতুর্বিন ঘুরিতেছে

জন্য একটি বিরাট জলাশয়ের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং শীতকালে সেই জলকে কার্য্যে লাগান হয়। জলাশয় হইতে জল পাইপ বা নলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া স্রোতোদ্বারের (Sluice) মুখে আসে এবং সেখান হইতে জলতুর্বিনের উপর পতিত হয়। জলতুর্বিনে বহু জলাধার থাকে এবং পতিত জল ঐ পাত্রগুলিতে সঞ্চিত হয় ও পাত্রগুলি তলার দিকে আসিলে জল বাহির হইয়া যায় (১৭নং চিত্র দেখ)। যে কোন সময়ে জলাধারগুলির অর্দ্ধেক পতিত জলে পরিপূর্ণ থাকে এবং জলের ভারে জলতুর্বিন ঘুরিতে থাকে। এই ঘূর্ণায়মান জলতুর্বিনের সাহায্যে কল-কারখানাকে চালু রাখা যায়; ডায়নামোতে (dynamo) ঐ শক্তি প্রযুক্ত করিয়া তাড়িত শক্তি উৎপন্ন করা যায়। তাড়িত শক্তি মানবের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে।

এইবার দেখা যাক, জলের গতিশক্তি কিভাবে জলতুর্বিনকে আবর্ত্তিত করে। বাঁধের সাহায্যে জলধারার দৈর্ঘ্য সঙ্কীর্ণ করা হয় এবং সমস্ত জল স্রোতোদ্বারের (sluice) মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। অত বিশাল পরিমাণ জল ছোট দ্বার দিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করে বলিয়া ঐখানে স্রোতধারা অত্যন্ত প্রবল হয় এবং ফলে জলের গতিশক্তি তীব্র হয়। জলের এই তীব্র গতিশক্তি স্রোতোদ্বারের নিকট অবস্থিত জলতুর্বিনের পাখাগুলিতে ধাক্কা দিতে থাকে এবং ফলে জলতুর্বিন ঘুরিতে থাকে (১৮নং চিত্র দেখ)।
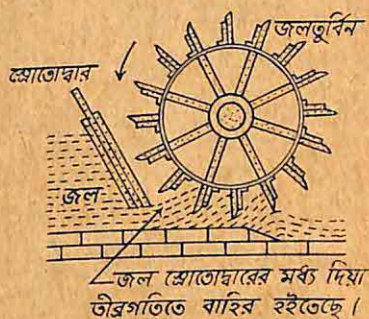
১৮নং চিত্র — স্রোতোদ্বার হইতে নির্গত জলের তীব্র গতিশক্তির জন্য জলতুর্বিন ঘুরিতেছে

এই ঘূর্ণায়মান জলতুর্বিনের সাহায্যে কল-কারখানাচালু রাখা যায়; ডায়নামোতে ঐ শক্তি প্রযুক্ত করিয়া তাড়িত শক্তি উৎপন্ন করা যায়।

বায়ুশক্তি (Air Power) :—প্রবাহমান বায়ুর যে শক্তি আছে, তাহা তোমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছ। কিছুদিন আগেও ইউরোপ,
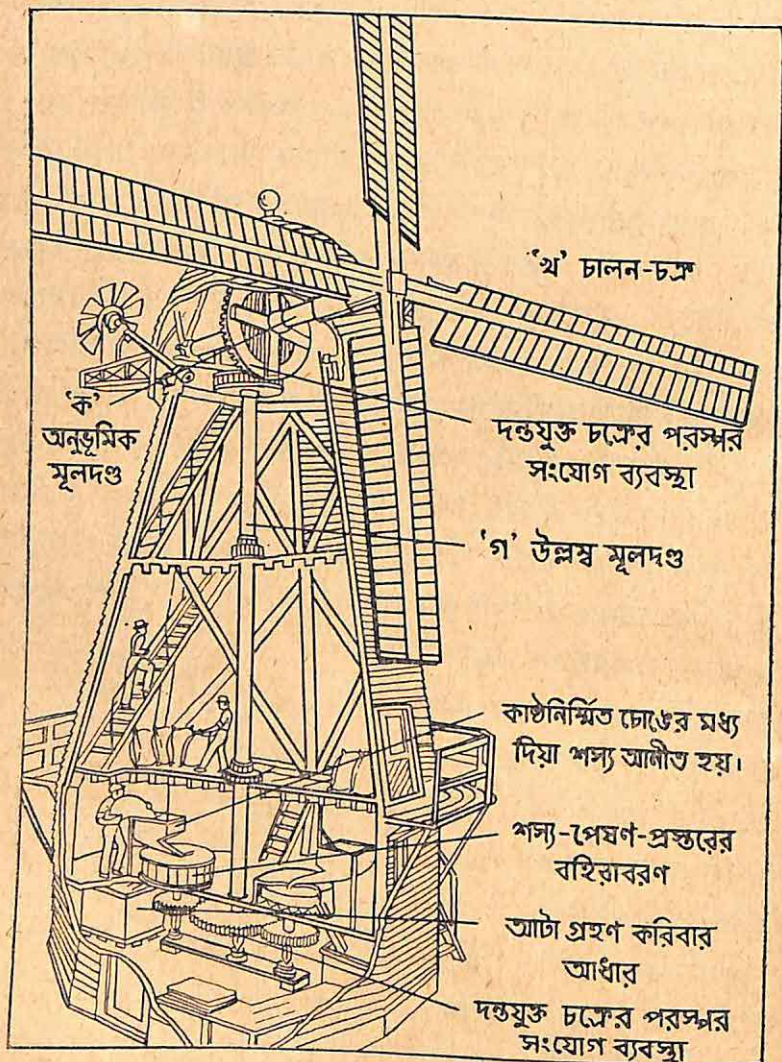
১৯নং চিত্র—বায়ুকলে গম ভাঙ্গা হইতেছে

ও মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলিতে ছোট ছোট শিল্পে এই শক্তির ব্যবহার

বেশ দেখা যাইত। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এখনও এই শক্তির ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু এই শক্তির ব্যবহারে কতকগুলি অসুবিধা থাকায় (যেমন বায়ুর গতি অসম, ইহা দিক পরিবর্ত্তন করে ইত্যাদি) ষ্টিম, তাড়িত ইত্যাদি শক্তি ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

বায়ুকল (wind mill) বায়ুশক্তির সর্ব্বপ্রথম ব্যবহারিক যন্ত্র। বায়ুকল যন্ত্রটি কিরূপ তাহা ১৯নং চিত্রে দেখান হইয়াছে। একটি উচ্চ স্তম্ভের শীর্ষদেশে 'ক' অনুভূমির মূলদণ্ড (horizontal shaft) রোলার বিয়ারিং (roller bearing)এ আবদ্ধ ও তাহার সহিত সংযুক্ত কতকগুলি পাখা সমেত 'খ' চালন-চক্র (propeller)। বায়ুপ্রবাহের দিক্ পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে যাহাতে চালন-চক্র সেই অভিমুখে থাকিতে পারে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও থাকে। বায়ুর গতিশক্তির আঘাতে চালন-চক্র ঘুরিতে থাকে এবং ফলে অনুভূমিক মূলদণ্ড আবর্ত্তিত হয়। দন্তযুক্ত চক্রের পরস্পর সংযোগ ব্যবস্থার দ্বারা (toothed gear arrangement) 'ক' অনুভূমিক মূলদণ্ডের ঘূর্ণ্যমান গতি উল্লম্ব মূলদণ্ড (vertical shaft) 'গ'তে প্রযুক্ত হয় এবং 'গ' মূলদণ্ডের ঘূর্ণ্যমান গতির সাহায্যে অনেক কার্য্য সম্পন্ন করা যায়—যেমন গম ভাঙ্গা, জল উত্তোলন করা ইত্যাদি। চিত্রে গম ভাঙ্গান দেখান হইতেছে।

সজীব যন্ত্রের সহিত জড় যন্ত্রের তুলনা :—জীব ও জড়ের মধ্যে কি পার্থক্য, তাহা আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব। জীবের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহাতে উহাকে যন্ত্র বলিয়া কল্পনা করা যায়। এখন জড় পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত যন্ত্র হইতে এই যন্ত্রের কি পার্থক্য তাহা আমাদের আলোচনার বিষয়। যদি কোন জড় যন্ত্রের সহিত (যেমন রেল-ইঞ্জিন) সজীব যন্ত্রের (যেমন মানবদেহ) তুলনা করা হয়, তবে আমরা কতকগুলি সাদৃশ্য এবং কতকগুলি প্রভেদ লক্ষ্য করিব। প্রভেদগুলি এতই সুস্পষ্ট যে,

উহার ভিত্তিতেই জীবকে জড় হইতে পৃথক করা হয়। মানবের গমনশক্তি আছে; রেল-ইঞ্জিনেরও তদ্রূপ গমনশক্তি আছে। রেল-ইঞ্জিনকে সচল রাখিতে হইলে কয়লা পোড়ান প্রয়োজন; তেমনি মানবদেহকে সক্রিয় রাখিতে হইলে দেহমধ্যে সঞ্চিত ও শোষিত খাদ্য বস্তুর দহনের প্রয়োজন (অর্থাৎ খাদ্য ইন্ধনের কার্য্য করে)। ছাই, ধোঁয়া ইত্যাদি রেল-ইঞ্জিনের পরিত্যক্তাংশ; পায়খানা, প্রস্রাব ইত্যাদি মানবদেহের পরিত্যক্তাংশ। এইবার প্রভেদগুলি দেখা যাক। মানবের প্রাণ আছে, চেতনা আছে ও বোধশক্তি আছে; রেল-ইঞ্জিনের এই গুণগুলি নাই। মানব বংশবিস্তার করিতে পারে অর্থাৎ শিশুর জন্ম দিতে পারে; রেল-ইঞ্জিনের পক্ষে তাহা সম্ভব নয় অর্থাৎ রেল-ইঞ্জিন ছোট রেল-ইঞ্জিনের জন্ম দিতে পারে না। মানব পুষ্টির দ্বারা কলেবর বৃদ্ধি করে; রেল-ইঞ্জিনে এইরূপ ক্রিয়া দেখা যায় না। মানব উদ্দীপনায় সাড়া দেয়—যেমন তপ্ত জিনিসে বা শীতল বরফে হাত ঠেকিলে আমরা হাত সরাইয়া লই। যদিও রেল-ইঞ্জিনের বিভিন্ন কল টিপিলে ইঞ্জিন ষ্টার্ট নেয়, উহার বাঁশী বাজে কিন্তু এই ক্রিয়াগুলির সহিত মানবদেহের উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া প্রক্রিয়ার কোনরূপ তুলনাই চলে না। এই প্রভেদগুলি এতই সুস্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ যে, সজীব যন্ত্রকে জড় যন্ত্রের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। তাছাড়া জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ যে, ইহাকে যন্ত্র বলিয়া মনে করা উচিত নহে।

অনুশীলন

১। শক্তি কাহাকে বলে? 'সূর্য্য সকল শক্তির উৎস এই উক্তিটি আলোচনা কর।

২। জল ও বায়ুর শক্তি কিভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তাহা বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

তাপ—উহার উৎস ; তাপ ও উষ্ণতা ; জড় পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া

তাপ (Heat) :—উত্তপ্ত লৌহ হাতে গরম লাগে, বরফ হাতে ঠাণ্ডা লাগে। ঠাণ্ডা-গরম বোধ সকলেরই আছে। একটি পাত্রে ঠাণ্ডা জল লইয়া উনুনে চাপাইলে কিছুক্ষণ পরে উহা গরম হইয়া যায়। **যে বাহ্যিক কারণের প্রভাবে ঠাণ্ডা জিনিস গরম হয়, তাহাকে তাপ বলে।** তাপে জল বাষ্প হয়। বাষ্পের চাপে রেল-ইঞ্জিনের চাকা ঘোরে। চাকার এই গতিশক্তি আসে তাপ হইতে। সুতরাং **তাপ এক প্রকার শক্তি।**

সকল বস্তুতেই তাপ আছে। ঠাণ্ডা বস্তুতে তাপ নাই মনে করা ভুল। গ্যাসীয় বায়ুকে শৈত্যের দ্বারা তরল করা যায়। তরল বায়ু বরফ অপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা। এক কেট্‌লি তরল বায়ুকে একচাপ বরফের উপর বসাইয়া রাখিলে, উনুনের উপর জল ফোটার ন্যায় উহা ফুটিতে থাকে। ইহাতে বুঝা যায়, তাপ বরফ হইতে তরল বায়ুতে যাইতেছে।

তাপের উৎস (Sources of heat) :—তাপের (১) প্রধান ও মূল উৎস সূর্য্য। সূর্য্য হইতে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমস্ত তাপ সংগ্রহ করি ; (২) দ্বিতীয় উৎস, ভূগর্ভ ; (৩) তৃতীয় রাসায়নিক ক্রিয়া : অম্লজান ও উদজানের মিলনের সময় প্রভূত তাপ উৎপন্ন হয় ; (৪) চতুর্থ তড়িৎ : তাড়িত শক্তি সরু তারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিলে তার উত্তপ্ত হইয়া উঠে ; (৫) পঞ্চম,

ঘর্ষণাদি বাহ্যিক ক্রিয়াঃ দুইটি কঠিন পদার্থ ঘর্ষণ করিলে তাপ উৎপন্ন হয়।

সূর্য্যোত্তাপের ক্রিয়া (Effect of Sun's heat):—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাপের প্রধান ও মূল উৎস সূর্য্য। পৃথিবীর উপর এই উত্তাপের ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিবে।

সূর্য্য একটা প্রচণ্ড অগ্নিময় গোলক। অসীম তেজোরাশি ইহা হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া সৌরজগতের চতুর্দ্দিকে অবিরত বিকীর্ণ হইতেছে। সেই বিকীর্ণ শক্তির পথে থাকিয়া গ্রহ-নক্ষত্রাদি তাহার কিয়দাংশ গ্রহণ করিতেছে। আমাদের পৃথিবী সূর্য্য হইতে প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া সূর্য্যোত্তাপের অতি সামান্য অংশ পাইতেছে। উহারই ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে ঋতু পরিবর্ত্তন, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তাপ না পাইলে পৃথিবীতে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থমাত্রই জমিয়া কঠিন হইত। সেরূপ অবস্থায় কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারিত না। তোমরা জান, **সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ ভিন্ন উদ্ভিদ্ তাহার খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। প্রাণীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ্ ভোজন করিয়া বাঁচিয়া থাকে। কাজেই প্রাণী ও উদ্ভিদ্দের পক্ষে সূর্য্যের উত্তাপ একান্ত প্রয়োজনীয়।** আমরা কয়লা, কাঠ, কেরোসিন প্রভৃতি জ্বালাইয়া যে উত্তাপ উৎপন্ন করি, তাহাও ঐ সূর্য্যের শক্তি। আমাদের অগোচরে সৌরশক্তি ঐ সকল দ্রব্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তাপের সাহায্যে জল বাষ্প হইয়া বাতাসের সহিত মিশিয়া যায়। সেই জলীয় বাষ্প শিশির, কুয়াশা, তুষার, শিলা ও বৃষ্টিতে পরিণত হয়। বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িয়া ভূমির উর্ব্বরতা সাধন করে। উহার কতকটা মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া ঝরণার আকারে বাহির হয়। ঝরণা এবং উচ্চ পর্ব্বতের তুষার গলা জলে নদ-নদীর

সৃষ্টি হয়। জলস্রোত উচ্চভূমি হইতে মাটি বহিয়া আনিয়া স্থলভাগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীর উপর সূর্য্যের উত্তাপের ক্রিয়া সামান্য নহে।

তাপের স্বরূপ (Nature of heat) :—পূর্ব্বে লোকে মনে করিত, তাপ 'ক্যালোরিক' (Caloric) নামক একপ্রকার অদৃশ্য ওজনশূন্য জিনিস। ইহা পদার্থের আণবিক ফাঁকের মধ্যে অবস্থান করে এবং উষ্ণ পদার্থ হইতে ক্যালোরিক শীতল পদার্থে প্রবাহিত হয়। ইহাকে **ক্যালোরিক মতবাদ** (Caloric Theory) বলে। প্রায় ১৮০০ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। জার্ম্মাণীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশের যুদ্ধমন্ত্রী কাউণ্ট রামফোর্ড (Count Rumford) ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এই মতবাদ খণ্ডন করেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, পিতলের কামানে ভোঁতা তূরপুণ (drill) দ্বারা ছিদ্র করার সময় এত তাপ উৎপন্ন হয় যে, জল ফুটিয়া বাষ্প হইয়া যায়। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় এই তাপ উৎপন্ন হয়। ইহার পর বৈজ্ঞানিক ডেভি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, বায়ুশূন্য পাত্রে দুই খণ্ড বরফ ঘষিলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহাতে বরফ গলিয়া যায়। এই সকল পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর গতিশক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং তাপ এক প্রকার শক্তি। আধুনিক মতে অণুর গতীয় শক্তি হইতে তাপ উদ্ভূত হয়। অণুর গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে পদার্থে তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। কোন পদার্থকে উষ্ণ করার অর্থ অণুর গতীয় শক্তি বৃদ্ধি করা। ইহাই তাপের **গতীয় মতবাদ** (Dynamic Theory) নামে পরিচিত।

উষ্ণতা (Temperature) :—তাপ ও উষ্ণতা একার্থজ্ঞাপক নহে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, প্রত্যেক বস্তুর তাপ আছে। একপাত্র উত্তপ্ত জলে যদি খানিকটা ঠাণ্ডা জল মিশান হয় তবে

পাত্রের মধ্যকার মোট তাপের পরিমাণ বাড়িবে কারণ ঠাণ্ডা জলেও খানিকটা তাপ আছে। এখন পাত্রের জলে হাত ডুবাইলে দেখিবে যে, পাত্রের জল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ যে, আমাদের গরম-ঠাণ্ডার অনুভূতি বস্তুর সঞ্চিত মোট তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। যাহার উপর নির্ভর করে তাহাকে উষ্ণতা বলা হয়। একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুর সংস্পর্শে থাকিলে একটি হইতে অন্যটিতে তাপ প্রবাহিত হইতে পারে (যদি না উষ্ণতা তাহাদের সমান থাকে)। যে বস্তু হইতে তাপ বাহির হয় তাহার উষ্ণতা বেশী, যে বস্তুটি তাপ গ্রহণ করে তাহার উষ্ণতা কম। **উষ্ণতা বস্তুর তাপ সম্বন্ধীয় বা তাপীয় একটি অবস্থা (thermal condition) যাহাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়, বস্তুটি সংস্পৃষ্ট বস্তুকে তাপ প্রদান করিবে না নিজে তাহা হইতে তাপ গ্রহণ করিবে।**

একখানি লোহার থালাকে জ্বলন্ত উনুনের উপর এক মিনিটকাল রাখিয়া সরাইয়া লও ; ঐ উনুনের উপর এক বাল্‌তি জল ঠিক এক মিনিটকাল রাখিয়া নামাইয়া লও। লোহার থালা ও জল স্পর্শ করিয়া দেখ, থালাখানি জল অপেক্ষা অনেক বেশী গরম হইয়াছে। অথচ ঐ থালা ও জল একই সময় ব্যাপিয়া উনুনের একই উত্তাপ পাইয়াছে। থালাখানি ঐ জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া দেখ, থালার উষ্ণতা একটু কমিয়াছে এবং জলের উষ্ণতা একটু বাড়িয়াছে। অর্থাৎ থালা হইতে খানিকটা তাপ জলে আসিয়াছে। কতক্ষণ আসিবে ? যতক্ষণ না উভয়ের উষ্ণতা সমান হইবে। এই পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে, (১) **সমপরিমাণ তাপ দুইটি জিনিসে প্রয়োগ করিলেও তাহাদের উষ্ণতা সমানভাবে বাড়ে না** ও (২) **গরম জিনিস হইতে তাপ সর্বদাই ঠাণ্ডা জিনিসে চলিয়া আসে।**

তাপমান যন্ত্র বা থার্ম্মোমিটার (Thermometer) ঃ—তিনটি পাত্রে জল আছে। প্রথমটির জল ঠাণ্ডা, দ্বিতীয়টির জল অল্প

গরম এবং তৃতীয়টিতে বেশ গরম জল আছে। তৃতীয় পাত্রের জলে প্রথমে তোমার হাত ডুবাও, তারপর ঐ হাত তুলিয়া দ্বিতীয় পাত্রে ডুবাইলে তুমি বলিবে, এই জল ঠাণ্ডা। আবার প্রথম পাত্রের ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবানোর পর পুনরায় দ্বিতীয় পাত্রে হাত ডুবাও। এবারে কি বলিবে ? নিশ্চয় বলিবে যে দ্বিতীয় পাত্রের জল গরম। কাজেই দেখ, তুমিই একই জলকে একবার বলিতেছ গরম একবার বলিতেছ ঠাণ্ডা। **সুতরাং আমাদের স্পর্শশক্তি দ্বারা পদার্থের উষ্ণতা (temperature) ঠিক করিয়া বলা যায় না।** সেই কারণে পদার্থের উষ্ণতা মাপিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তাহার নাম **তাপমান যন্ত্র** বা **থার্ম্মোমিটার**। উত্তাপের পরিমাণ ভেদে তরল বস্তুর আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। এই নিয়ম অবলম্বনে এই যন্ত্রটি গঠিত।

থার্ম্মোমিটার নির্ম্মাণ প্রণালী (Construction of thermometer) :—আগাগোড়া সমান সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট একটি কাচের নলকে বুন্‌সেন বাতির সাহায্যে উত্তাপ দিয়া টানিয়া একটি কৈশিক নলে (capillary tube) পরিণত কর ; ইঞ্চি পাঁচেক পরিমাণ এই কৈশিক নলের এক প্রান্ত গলাইয়া একটা বাল্‌ব (bulb) প্রস্তুত করিয়া লও ; পরে ঐ নলটিকে তাপের সাহায্যে পরিষ্কার ও শুষ্ক করিয়া উহার মুখ খানিকটা বিশুদ্ধ পারদের মধ্যে ডুবাইয়া দাও। সাধারণতঃ ঐ কৈশিক নল দিয়া পারদ ভিতরের বাল্‌বে প্রবেশ করিবে না ; কিন্তু নীচের বাল্‌বের বাহিরে খানিকটা উত্তাপ দিলে নলের বায়ু প্রসারিত হইয়া নল মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। পরে বাল্‌বটি ঠাণ্ডা হইলে ভিতরের বায়ু সঙ্কুচিত হইবে এবং অপর মুখটি যদি এতক্ষণ পারদের পাত্রের মধ্যে ডুবান থাকে তবে দেখিবে, খানিকটা পারদ এবার কৈশিক নল দিয়া বাল্‌বটিতে পৌঁছিয়াছে। এইরূপে বাল্‌বটিকে পর্য্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা

করিলে (নলের অপর মুখটি সর্ব্বক্ষণই পারদ পাত্রে নিমজ্জিত রাখিতে হইবে) বাল্‌বটি পারদ-পূর্ণ হইয়া যাইবে। উহাকে এমন ভাবে পারদ-পূর্ণ কর যাহাতে বাল্‌বটি ভর্ত্তি হইয়া খানিকটা পারদ কৈশিক নলের মধ্যে অবস্থান করে। এক্ষণে বাল্‌বটিকে গরম কর যতক্ষণ না পারদ ফোটে; নলের ভিতর এবং পারদের মধ্যে যত বায়ু ছিল তাহা বাহির হইয়া যাইবে এবং ঐ সমগ্র কৈশিক নলটি এখন শুধু পারদের বাষ্পে পূর্ণ হইয়া থাকিবে। ঠিক এই অবস্থায় নলের খোলা মুখটি তাপ দিয়া ভালভাবে বন্ধ করিয়া দাও। এই যন্ত্রটি এখন **থার্ম্মোমিটারের** রূপ গ্রহণ করিল। এক্ষণে এই যন্ত্রটির **তাপমাত্রা** (gradation) নির্ণয় করিতে হইবে। ইহার জন্য যন্ত্রটির বাল্‌ব ও কৈশিক নলের কিছু অংশ প্রথমে ফানেলস্থিত গলমান ছোট ছোট খণ্ড বরফের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। তাপ হারাইয়া তাপমান যন্ত্রে পারদ সঙ্কুচিত হয় এবং পারদ সূত্রটি ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিতে থাকে। নামিতে নামিতে যে স্থানে পারদ সূত্র স্থির হইয়া দাঁড়ায়, সেইখানে একটি দাগ কাটা হয়। এই দাগই তাপমান যন্ত্রের **অধোবিন্দু** (Lower Fixed Point) এবং ইহা বরফের দ্রবণাঙ্ক (Melting Point) বা জলের হিমাঙ্ক (Freezing Point) নির্দ্দেশ করে (২১নং চিত্র দেখ)।

২০নং চিত্র-থার্ম্মোমিটার

তারপর তাপমান যন্ত্রটিকে **হিপসোমিটার** (Hypsometer) নামক একটা ফুটন্ত জলের আধারে প্রবেশ করান হয়। জলের বাষ্প যন্ত্রটির অঙ্গে লাগিয়া উহাকে উত্তপ্ত করে। তাপ পাইয়া পারদ সূত্র ক্রমশঃই উপর দিকে উঠিতে থাকে। এই পারদ

সূত্র] যে পর্য্যন্ত উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায় সেইখানে আর একটি দাগ কাটা হয়। এই দাগই তাপমান যন্ত্রের **উর্দ্ধবিন্দু** (Upper Fixed Point) এবং ইহা জলের স্ফুটনাঙ্ক (Boiling Point) নির্দ্দেশ করে (২২নং চিত্র দেখ)।
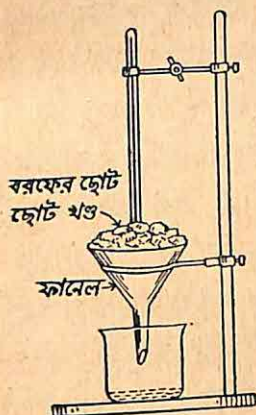
২১নং চিত্র—থার্ম্মোমিটারের অধোবিন্দু নির্ণয়করণ
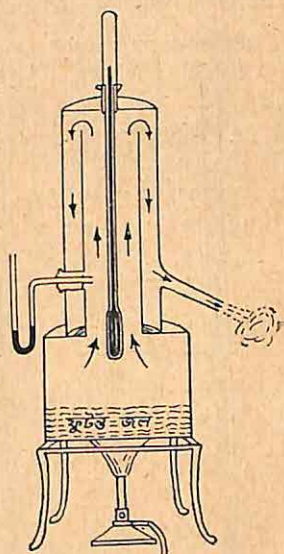
২২নং চিত্র—হিপসোমিটারের সাহায্যে থার্ম্মোমিটারের উর্দ্ধবিন্দু নির্ণয়করণ

এই দুই দাগ পাওয়ার পরে উহার স্থানকে উষ্ণতা পরিমাপের বিবিধ পদ্ধতি অনুযায়ী কতকগুলি সমান ভাগে (equal divisions) ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগের নাম ডিগ্রী। অঙ্কের মাথায় একটি ছোট শূন্য বসাইয়া একটি ডিগ্রী জানান হয়। এইরূপে যে যন্ত্রটি প্রস্তুত হইল তাহাকে তাপমান যন্ত্র বা থার্ম্মোমিটার বলে।

উষ্ণতা পরিমাপের বিবিধ পদ্ধতি (Scales of temperature) :—
উষ্ণতা পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি চলিত আছে :—(১) সেন্টি-গ্রেড (Centigrade), (২) **ফারেনহাইট্** (Fahrenheit) ও (৩)

রেমার (Reaumur)। সেন্টিগ্রেড্ স্কেলে অধোবিন্দু ও ঊর্দ্ধবিন্দুর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে সমান একশত ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগের নাম ডিগ্রী। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রভৃতিতে সেন্টিগ্রেড্ থার্ম্মোমিটারই বেশী ব্যবহৃত হয়। ফারেনহাইট্ স্কেলে মধ্যবর্ত্তী স্থানকে সমান ১৮০ ভাগে ভাগ করা হয়; কিন্তু ইহার অধোবিন্দুর নিকট ৩২° ডিগ্রী ও ঊর্দ্ধবিন্দুর নিকট ২১২° ডিগ্রী লেখা হয়। ইহা ইংলণ্ড ও ইংরেজ রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচলিত। পরীক্ষকগণ আবহাওয়ার উষ্ণতা সাধারণতঃ এই স্কেলেই প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপরোক্ত দুই প্রকার স্কেলের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে ১° ডিগ্রী
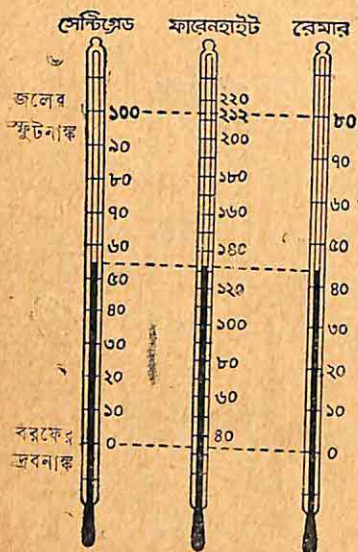
২৩নং চিত্র – উষ্ণতা পরিমাপের বিবিধ পদ্ধতি

সেন্টিগ্রেড্ $=\frac{১৮০^\circ}{১০০^\circ}=\left(\frac{৯}{৫}\right)^\circ$ ফারেনহাইট্। সুতরাং সেন্টিগ্রেড্ হইতে ফারনহাইট্ অথবা ফারেনহাইট্ হইতে সেন্টিগ্রেড্ স্কেলে যাওয়া কিছু কঠিন নহে। মনে কর, কোন একটি পদার্থের উষ্ণতা ৪০° C হইলে উহা $৪০\times\frac{৯}{৫}+৩২=১০৪^\circ F$ হইবে; আবার $১০৪^\circ F=(১০৪-৩২)\times\frac{৫}{৯}=৪০^\circ C$।

রেমার স্কেলে সর্ব্বনিম্ন দাগকে ০° ডিগ্রী ও সর্ব্বোচ্চ দাগকে ৮০° ডিগ্রী ধরিয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ৮০ ভাগে ভাগ করা হয়। এই স্কেল রুশদেশের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয় এবং ইউরোপের কোন কোন স্থানে ইহার প্রচলন আছে।

ক্লিনিকাল থার্মোমিটার (Clinical thermometer) :— ডাক্তারগণ জ্বর দেখিবার জন্য যে তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করেন তাহাকে ক্লিনিকাল থার্মোমিটার বলে (২৪নং চিত্র দেখ)। ইহাতে ফারেনহাইট্ স্কেল আছে ; তবে মনুষ্যদেহে তাপের মাত্রা বেশী উঠানামা করে না বলিয়া উহাতে ৯৫ অঙ্ক হইতে ১১০ অঙ্ক পর্য্যন্ত দাগ কাটা থাকে। এই যন্ত্রের পারদ গোলক ও ফাঁপা নলের সংযোগস্থলের ছিদ্র অতি সূক্ষ্ম। ফলে পারদ তাপ-যোগে বাড়িয়া গেলে উহা আর আপনা হইতে গোলকের মধ্যে পড়িয়া যাইতে পারে না ; ঝাঁকি দিয়া নামাইতে হয়। এইজন্য শরীরের উত্তাপ হইতে যন্ত্রটিকে বাহির করিলে সঙ্গে সঙ্গে উহার পারদসূত্র নামিয়া যায় না এবং সহজে পড়া যায়।

২৪নং চিত্র—ক্লিনিকাল থার্মোমিটার

থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহৃত হয় কেন (Why mercury is chosen in the construction of a thermometer) ?—তোমরা জান যে তাপের প্রভাবে কঠিন পদার্থের বৃদ্ধি খুবই কম হয় ; এজন্য কঠিন পদার্থ দিয়া থার্মোমিটার তৈয়ার করা চলে না। আবার তাপ প্রয়োগে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন খুবই বেশী বৃদ্ধি পায় এবং উহার আয়তন-বৃদ্ধি চাপের উপর নির্ভর করে। কাজেই গ্যাসীয় পদার্থের সাহায্যে থার্মোমিটার তৈয়ার করা সুবিধাজনক নহে ; এজন্য থার্মোমিটারে তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয়। তরল পদার্থের মধ্যে পারদ ব্যবহার করা সবচেয়ে সুবিধাজনক কারণ (১) পারদের স্ফুটনাঙ্ক ৩৬০° সেন্টিগ্রেড্ এবং হিমাঙ্ক-৩৯° সেন্টিগ্রেড্। সুতরাং পারদ ব্যবহার করিলে তাপমাত্রার অনেক ব্যবধান পর্য্যন্ত মাপা যায় ; জলের ক্ষেত্রে এ সুবিধা নাই। (২) পারদের প্রসারণ

সমানভাবে হয়। (৩) পারদের তাপ পরিচলন শক্তি অধিক বলিয়া উত্তপ্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে পারদ অল্প সময়েই ঐ বস্তুর সমান উত্তপ্ত হয়। (৪) পারদ সহজেই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং ইহা চক্‌চকে অস্বচ্ছ তরল পদার্থ বলিয়া উহার অবস্থান সহজেই ও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। (৫) পারদ নলের গায়ে লাগিয়া থাকে না।

থার্ম্মোমিটারের ব্যবহার (Uses of thermometer):— থার্ম্মোমিটারের প্রধান ব্যবহার উষ্ণতা পরিমাপে। কোন স্থানের আবহাওয়ার উষ্ণতা মাপিবার জন্য নানা প্রকারের থার্ম্মোমিটার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন স্থানের উচ্চতা মাপিবার জন্যও এই যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব। সাধারণতঃ ৩০০ ফুট উপরে উঠিলে থার্ম্মোমিটারের ১° ডিগ্রী উত্তাপের পতন হয়। কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং যাইলে দেখিবে যে, থার্ম্মোমিটারের প্রায় ২০° ডিগ্রী পতন হইয়াছে। সুতরাং মোটামুটিভাবে দার্জ্জিলিং ৩০০ × ২০ = ৬০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

জড় পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া
(Effect of Heat on Matter)

১। **তাপ প্রয়োগে জড় পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়; তাপ কমাইলে আয়তনের সঙ্কোচ হয়।** কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের উপর উত্তাপের ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমরা ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিব।

২। **তাপ প্রয়োগে পদার্থের উষ্ণতা বাড়ে; তাপ কমাইলে উহার উষ্ণতা কমিয়া যায়।** খানিকটা জলে তাপ দাও। উহা গরম হইল। এখন একবার ঠাণ্ডা জলে হাত দাও এবং তারপর ঐ গরম জলটায় হাত দাও। দেখ, উহাদের উষ্ণতার প্রভেদ আছে।

৩। **তাপ প্রয়োগে পদার্থের অবস্থাগত পরিবর্ত্তন ঘটে।** কঠিন বরফ গলিয়া জল হয় এবং তরল জল গ্যাসীয় বাষ্পে পরিণত হইয়া

থাকে। জলীয় বাষ্প হইতে তাপ বাহির করিয়া লইলে উহা প্রথমে তরল জলে এবং তারপর কঠিন বরফে পরিণত হয়।

৪। **তাপ প্রয়োগে পদার্থের কতকগুলি বাহ্যিক গুণের পরিবর্ত্তন হয়**—যথা স্থিতিস্থাপকতা, দ্রবণ-ক্ষমতা, তাপ ও তাড়িত পরিবহন ক্ষমতা, চৌম্বকত্ব ইত্যাদি। অনেক পদার্থকে খুব বেশী উত্তপ্ত করিলে ভাস্বর হইয়া উঠে ও আলোক বিকিরণ করিতে থাকে। ইহাকে **ভাস্বরতা** (Incandescence) বলে। চূণকে যখন অক্সি-হাইড্রোজেন অগ্নিশিখায় খুব বেশী উত্তপ্ত করা হয় তখন উহা ভাস্বর হইয়া উঠে ও আলোক বিকিরণ করে। চূণকে ঐরূপ উত্তপ্ত করার দরুণ উহার কোনরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় না। বহু ক্ষেত্রে উত্তাপ যোগে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় এবং তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়—যেমন ম্যাগ্‌নেসিয়াম, কয়লা প্রভৃতি বস্তুর দহন। এখানে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সহ ভাস্বরতা পরিলক্ষিত হয়।

৫। **তাপ প্রয়োগে অনেক পদার্থের রাসায়নিক অর্থাৎ গঠনমূলক পরিবর্ত্তন ঘটে।** ধানকে উত্তপ্ত করিলে খই হয়। একখণ্ড কাষ্ঠে তাপ প্রয়োগ করিলে ক্রমশঃ উহা কালো কয়লায় পরিণত হয়। কিছুক্ষণ পরে উহা পুড়িতে থাকে অর্থাৎ বাতাসের অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে। তাপ প্রয়োগে ধান ও কাষ্ঠের স্থায়ী রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিল।

কঠিন পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া (Effect of heat on solid bodies) :—**তাপ প্রয়োগে** কঠিন পদার্থের উপর এই তিনটি প্রভাব সাধারণতঃ দেখা যায়। **প্রথমতঃ**, তাপের প্রভাবে কঠিন পদার্থগুলি গরম হয় বা উহাদের **উষ্ণতা** বাড়ে। সূর্য্যতাপে মাটি ও বালি কি রকম উত্তপ্ত হয় তাহা তোমরা সকলেই জান। **দ্বিতীয়তঃ**, তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের **অবস্থার পরিবর্ত্তন** হয় অর্থাৎ কঠিন

পদার্থ তরল পদার্থে পরিণত হয়—যেমন বরফের জলে পরিণত হওয়া—তাহা তোমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছ। তৃতীয়তঃ, তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের আয়তন বাড়ে।

কঠিন পদার্থের যে আয়তন বাড়ে তাহা সহজেই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় :—

পরীক্ষা :—দুইটি একই মাপের বলয় ও একটি পিতলের গোলক লও (২৫নং ও ২৬নং চিত্র দেখ)। তাহাদের মাপ এইরূপ হইবে যে, গোলকটি বলয়ের মধ্য দিয়া অতি সহজে গলিতে পারে।
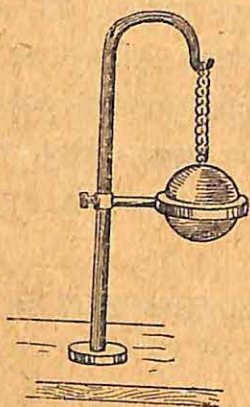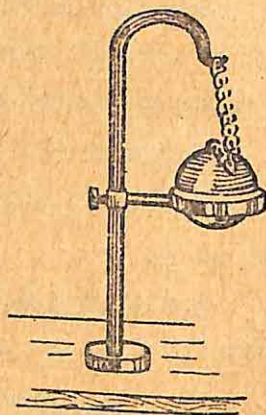
২৫নং চিত্র ২৬নং চিত্র

তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের আয়তন বৃদ্ধির পরীক্ষা

এইবার ফুটন্ত জলে ফেলিয়া গোলকটিকে গরম কর এবং পরীক্ষা করিয়া দেখ, এখন আর উহা বলয়ের ভিতর দিয়া গলিতেছে না (২৬নং চিত্র দেখ)। ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া গোলকটিকে ঠাণ্ডা কর এবং পরীক্ষা করিয়া দেখ, এবারে উহা সহজেই গলিতেছে। ইহার কারণ কি? কঠিন পদার্থমাত্রই উত্তপ্ত হইলে আয়তনে বাড়ে এবং শীতল হইলে তাহার আয়তন কমিয়া যায়।

প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ফল ও উহার প্রয়োগ (Practical examples of expansion and contraction) :—বস্তুমাত্রই

তাপে প্রসারিত ও শৈত্যে সঙ্কুচিত হয় জানিয়াছ। ইহার দরুণ নানা ব্যাপার অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। একটা চিম্‌নির উপর জল পড়িলে যে অংশে জল পড়ে সেই অংশ ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হয়। কাজেই এক অংশে তাপের দরুণ প্রসারণ ও অন্য অংশে জল পড়ার জন্য সঙ্কোচন হওয়ায় চিম্‌নি ফাটিয়া যায়। বিভিন্ন অংশের অসমান প্রসারণ ও সঙ্কোচনের জন্যই মাটিতে ফাটল হয়, পাহাড়-পর্ব্বতের অংশ খসিয়া যায়।

বোতলের মুখে কাচের ছিপি আঁটিয়া গেলে তাহা খুলিবার জন্য উহা একটু গরম করা হয় কেন এখন বুঝিতে পারিবে। তাপ প্রয়োগে বোতলের মুখ গরম হয় ও আয়তনে বাড়ে। ছিপিটি ভিতরে থাকায় তেমন গরম হয় না, কাজেই আয়তনে বাড়ে না। ফলে বোতলের মুখ একটু বড় হয় এবং ছিপিটি আল্‌গা হইয়া সহজে খুলিয়া যায়।

রেল লাইন পাতিবার সময় দুইখানা রেলের মধ্যে কিছু ফাঁক রাখা হয়। প্রখর রৌদ্রতাপে ও রেলগাড়ীর চাকার ঘর্ষণে উত্তপ্ত হইয়া রেল প্রসারিত হয়; ঐ ফাঁকটুকু না থাকিলে রেলগুলি মুখোমুখি পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করিয়া বাঁকিয়া যাইত।

আর একটি পরিচিত দৃষ্টান্তের কথা বলি। গরুর গাড়ীর চাকার যে পরিধি উহার বেড়ের পরিধি তাহার চেয়ে সামান্য ছোট থাকে। চাকায় বেড় লাগানর সময় বেড়টি গরম করা হয়। উহাতে বেড়ের আয়তন বাড়িয়া যায়। তখন ঐ চাকার উপর উহাকে বসাইয়া দেওয়া হয় এবং জল দিয়া ঠাণ্ডা করা হয়। বেড়টি ঠাণ্ডা হইয়া আবার আয়তনে কমে। তাই উহা চাকার উপর দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকে।

তরল পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া (Effect of heat on liquids) :—**তাপ প্রয়োগে** তরল পদার্থের উপর এই তিনটি প্রভাব

সাধারণতঃ দেখা যায়। **প্রথমতঃ**, তাপের প্রভাবে তরল পদার্থ গরম হয় অর্থাৎ উহার **উষ্ণতা** বাড়ে। **দ্বিতীয়তঃ**, তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থের প্রসারণ হয় অর্থাৎ উহার আয়তন বাড়ে এবং ফলে উহা লঘু হয়। কারণ ভর সমানই থাকে কিন্তু আয়তন বাড়ে। তরল পদার্থের অণুগুলি তেমন সজ্ঘবদ্ধ নয় বলিয়া তাপে ইহাদের প্রসারণ শক্তি কঠিন পদার্থের চেয়ে অনেক বেশী।

পরীক্ষা :—একটা সরু গলাবিশিষ্ট কাচের ফ্লাস্কের ভিতরে খানিকটা রঙীন জল বা পারদ লও। নলের যেখান পর্য্যন্ত জল বা পারদ রহিয়াছে, (২৭নং চিত্রের "ক" চিহ্ন) সেখানে একটা দাগ দাও। এখন ফ্লাস্কটিকে খাড়াভাবে গরম জলে বসাইয়া দেখ, নলের ভিতরে জল বা পারদ প্রথমতঃ দাগের কিছুটা নীচে নামিয়া পড়িবে (২৭নং চিত্রের "খ" চিহ্ন)। কারণ কাচের ফ্লাস্ক প্রথমে গরম হওয়ায় উহার আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাপের প্রভাবে তরল পদার্থের আয়তন কঠিন পদার্থ অপেক্ষা অনেক বেশী বাড়ে ; এই জন্য পরে যখন ভিতরের জল বা পারদ উত্তপ্ত হয়, তখন উহার আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ দাগ ছাড়াইয়া অনেক উপরে উঠে (২৭নং চিত্রের 'গ' চিহ্ন)। এই অবস্থায় ফ্লাস্কটিকে ঠাণ্ডা জলে বসাও এবং দেখ, উহা কেমন নামিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, কঠিন পদার্থের মত তরল পদার্থ উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত এবং শীতল হইলে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। **তৃতীয়তঃ**, তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় অর্থাৎ ইহা তরল অবস্থা হইতে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়।

২৭নং চিত্র—তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পরীক্ষা

গ্যাসীয় পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া (Effect of heat on

gases):—তাপ প্রয়োগে গ্যাসীয় পদার্থের উপর এই দুইটি প্রভাব সাধারণতঃ দেখা যায়। **প্রথমতঃ**, তাপ প্রয়োগে গ্যাসীয় পদার্থ গরম হয় অর্থাৎ উহার **উষ্ণতা** বাড়ে এবং **দ্বিতীয়ঃ**, উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ কঠিন ও তরল পদার্থ অপেক্ষা ঢের বেশী প্রসারিত হয়।

পরীক্ষা :—একটি বাতাসপূর্ণ বকযন্ত্রের (retort) মুখ জলের মধ্যে ডুবাইয়া উহার তলায় তাপ দাও। দেখ, উহার ভিতরকার বাতাস **উত্তপ্ত** ও **প্রসারিত হইয়া** বুদ্‌বুদের আকারে জল ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে (২৮নং চিত্র দেখ)। এখন উহাকে ঠাণ্ডা হইতে দাও। দেখ, ঠাণ্ডা হওয়ায় বাতাস সঙ্কুচিত হইতেছে এবং সেই কারণে বকযন্ত্রের ভিতরে জল প্রবেশ করিতেছে। শুধু বাতাস নহে, যে কোন গ্যাসীয় পদার্থের এইরূপ নিয়ম। সুতরাং **গ্যাসীয় পদার্থ** উত্তপ্ত **হইলে প্রসারিত হয় এবং শীতল হইলে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।**
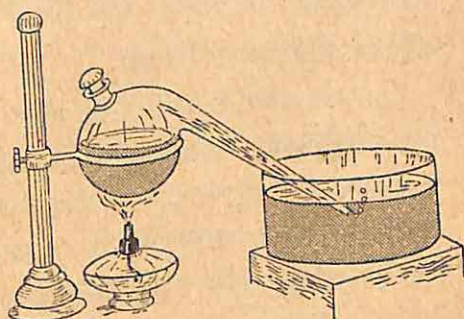
২৮নং চিত্র—তাপ প্রয়োগে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন বৃদ্ধির পরীক্ষা

অনুশীলন

১। তাপ ও উষ্ণতার মধ্যে প্রভেদ বুঝাইয়া দাও।

২। তাপের স্বরূপ কিরূপ? জড় পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া বর্ণনা কর।

৩। থার্মোমিটার নির্ম্মাণ প্রণালী বর্ণনা কর।

৪। উষ্ণতা পরিমাপের বিবিধ পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

তাপ সঞ্চালন

উত্তপ্ত বস্তুর ধর্ম্মই এই যে ইহারা ইহাদের তাপের কিয়দাংশ চতুর্দ্দিকের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বস্তুকে প্রদান করে অর্থাৎ তাপ উত্তপ্ত বস্তু হইতে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বস্তুতে সঞ্চালিত হয়। তিনটি বিভিন্ন প্রণালীতে তাপের এই সঞ্চালন হইয়া থাকে—**পরিবহন, পরিচলন** ও **বিকিরণ**।

১। **তাপের পরিবহন** (Conduction) :—**যে প্রক্রিয়া দ্বারা তাপ একই বস্তুর উষ্ণতর অংশ হইতে অপেক্ষাকৃত শীতলতর অংশে অথবা উষ্ণ বস্তু হইতে তাহার সহিত সংযুক্ত অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুতে অণুগুলির স্থানচ্যুতি না করিয়া সঞ্চালিত হয়, তাহাকে পরিবহন বলে।** কঠিন পদার্থ এই প্রণালীতে উত্তপ্ত হয় এবং নিম্নে পরীক্ষা দ্বারা তাহা বুঝান হইল।

পরীক্ষা :—একখানা লোহার হাতার এক প্রান্ত উনুনের আগুনের উপর রাখ। উহার অপর প্রান্ত এখন শীতল। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, উহার শীতল দিক এত গরম হইয়াছে যে আর উহাতে হাত দেওয়া যায় না। হাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তাপ চলিয়া আসিয়াছে। কিরূপে আসিল ? হাতার যে অংশটা আগুনের উপর রহিয়াছে, সেখানকার কম্পমান অণুগুলির স্পন্দন সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। সেই ক্রমবর্দ্ধমান স্পন্দন সংখ্যা পরস্পর-সংলগ্ন অণু হইতে অণুতে সঞ্চালিত হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত হাতাখানাই উত্তপ্ত হয়। অণুগুলি কিন্তু নিজ নিজ স্থানেই থাকিয়া যায়, স্থানচ্যুত হয় না। এইরূপে পরস্পর-সংলগ্ন অণুতে বা পদার্থে তাপের যে সঞ্চালন, তাহাকে তাপের **পরিবহন** বলে। সকল জিনিসের অণুর পরিবহন-শক্তি সমান নহে। যে সকল

বস্তু শীঘ্র তাপ পরিবহন করে, তাহারা তাপের **উত্তম পরিবাহী** (good conductor)। যাহারা সেরূপ করিতে পারে না, তাহারা তাপের **অপরিবাহী** (non-conductor)। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষায় দেখিলে যে, লোহার হাতা শীঘ্রই উত্তপ্ত হয় ; কাজেই লোহা তাপের উত্তম পরিবাহী। সাধারণতঃ সোনা, লোহা, পিতল, কাঁসা, তামা, রূপা প্রভৃতি ধাতু তাপের উৎকৃষ্ট পরিবাহী।

একটা বাতি, কাঠ বা মশালের এক প্রান্ত যখন জ্বলিতে থাকে, তখন উহাদের অপর প্রান্ত তুমি সহজেই ধরিয়া রাখিতে পার। ইহার কারণ ঐ সকল জিনিস ভালরূপে তাপ পরিবহন করে না। কাচ, মোম, পাথর, কাঠ, হাড়, চামড়া, বেত প্রভৃতি জিনিস তাপের অপরিবাহী। সেইজন্য দেখিতে পাও, লোহার হাতলে কাঠের বাঁট এবং গরম জলের কেট্‌লির ধরিবার স্থানে বেত জড়ান থাকে। ধাতুনির্ম্মিত হাতল ও কেট্‌লি ধরিবার স্থান শীঘ্রই উত্তপ্ত হইয়া উঠে কিন্তু কাঠ ও বেত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না।

পরিবহন প্রণালীতে তরল কিংবা গ্যাসীয় পদার্থকে উত্তপ্ত করা যায় না। পরীক্ষার নিমিত্ত একটি কাচের পরীক্ষ-নলে (test tube) এক টুকরো বরফ লও। লোহার খানিকটা জড়ান তার দিয়া বরফখানাকে নলের তলায় আবদ্ধ করিয়া রাখ। তারপর উহার উপরে জল ঢালিয়া দাও। এখন ঐ নলের উপর দিকের জলটায় তাপ দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, নলের মুখের কাছে জল যথেষ্ট উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতেছে। কিন্তু নীচের বরফ গলিতেছে না (২৯নং চিত্র দেখ)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জলের পরিবহন শক্তি খুবই কম।
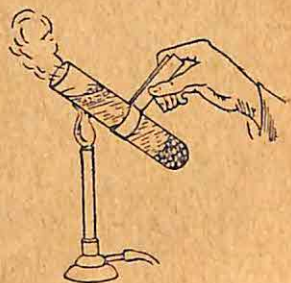
২৯নং চিত্র—পরিবহন প্রণালীতে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ উত্তপ্ত করা যায় না তাহার পরীক্ষা

গ্যাসীয় পদার্থের তাপ পরিবহনের ক্ষমতা খুবই কম। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ যে, শীতকালে একখানা লেপ গায়ে দিলে যতটা শীত কম লাগে, পর পর কয়েকখানা কাঁথা গায়ে চাপাইলেও ততটা শীত কম লাগে না। ইহার কারণ, লেপের ভিতরে তূলা থাকে এবং ঐ তূলার আঁশের ফাঁকে ফাঁকে বায়ু আবদ্ধ অবস্থায় থাকে; এবং যেহেতু বায়ুর পরিবহন শক্তি খুব কম সেহেতু শরীরের উত্তাপ খুব তাড়াতাড়ি লেপের বাহিরে চলিয়া আসিতে পারে না। অপরপক্ষে কাঁথার ভিতর হইতে শরীরের তাপ বাহির হইয়া আসিয়া শরীরকে অধিকতর শীতল করে। তাই শীতকালে লেপ ঢের বেশী গরম মনে হয়।

তাপের পরিচলন (Convection) :—যে প্রক্রিয়া দ্বারা তাপ উষ্ণতর স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত শীতলতর স্থানে উত্তপ্ত অণুগুলির নিজস্ব স্থানচ্যুতির দ্বারা সঞ্চালিত হয়, তাহাকে পরিচলন বলে। তরল পদার্থ ও গ্যাসীয় পদার্থ এই প্রণালীতে উত্তপ্ত হয়। প্রথমে তরল পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করা যাক।

পরীক্ষা :—একটি কাচপাত্রে জল লইয়া জলের তলায় খানিকটা রঙের গুঁড়া ফেলিয়া দাও। এখন পাত্রের নীচে তাপ দাও। লক্ষ্য করিয়া দেখ, জলের মাঝখান হইতে অর্থাৎ যেখানে উত্তাপ দেওয়া হইতেছে সেখান হইতে একটি স্রোত উপর পর্য্যন্ত উঠিয়া চারিপাশে বাঁকিয়া আবার তলায় পৌঁছিতেছে। রঙের সাহায্যে জলের স্রোত বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, সমস্ত জলটা রঙীন হইয়াছে এবং গরম হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিরূপে ইহা ঘটিতেছে, বুঝিয়া দেখ। পরিবহন
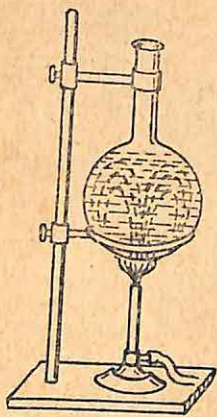
৩০নং চিত্র—তাপের পরিচলন

প্রণালীতে সর্ব্বপ্রথম কাচপাত্রের তলদেশ উত্তপ্ত হয়। কাচপাত্রের ভিতরে জলের সর্ব্বনিম্ন স্তরও উহার সংস্পর্শে থাকায় ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হইতে থাকে। উত্তপ্ত হওয়ার জন্য ঐ গরম জল আয়তনে বাড়ে ও হাল্কা হইয়া উপরে উঠিতে থাকে। ঐ হাল্কা জলের সঙ্গে রঙের কণাসকলও উপরে উঠিতে থাকে। উপরকার ও আশে পাশের ঠাণ্ডা ভারী জল নীচে নামিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপে নীচ হইতে উপরে এবং উপর হইতে নীচে জল উঠানামা করে বা একটা জলস্রোতের (convection current) সৃষ্টি হয় এবং উহার সঙ্গে রঙের কণাগুলিও উঠানামা করে। এইরূপে কিছুক্ষণের মধ্যেই পাত্রের সমস্ত জল রঙীন হয় এবং গরম হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করে (৩০নং চিত্র দেখ)। এইপ্রকার তাপ সঞ্চালনের প্রণালীকে **পরিচলন** বলে।

গ্যাসীয় পদার্থের পরিচলন :—কারখানার চুল্লীর চিম্‌নি বা লণ্ঠনের চিম্‌নির মধ্য দিয়া উত্তপ্ত বায়ু, ধোঁয়া ও উত্তপ্ত গ্যাসগুলি হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং চুল্লীর বা লণ্ঠনের নীচের ছিদ্র দিয়া বাহির হইতে শীতল ও ভারী বায়ু চুল্লীতে বা লণ্ঠনে প্রবেশ করে। এইরূপে একটি বায়ুর পরিচলন স্রোতের (convection current) সৃষ্টি হয় এবং প্রজ্বলনের জন্য প্রয়োজনীয় অম্লজান বায়ু হইতে আসে। যদি নীচের ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবে অম্ল-জানের অভাবে প্রজ্বলন সম্ভবপর হয় না। চিম্‌নি সরাইয়া লইলে বায়ু চলাচল সুষ্ঠভাবে হয় না, দহনের জন্য উদ্ভূত অঙ্গারাম্ল গ্যাস বিতারিত হয় না ও চতুর্দ্দিক হইতে আগত শীতল বায়ু শিখার উষ্ণতা কমাইয়া দেয়, ফলে অসম্পূর্ণ দহনক্রিয়া হয় ও ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়।

পরীক্ষা :—একটি পাত্রে জ্বলন্ত মোমবাতি রাখিয়া পাত্রে জল ঢাল। এইবার একটি সাধারণ চিম্‌নি পাত্রের ভিতর এমনভাবে রাখ যাহাতে মোমবাতিটি চিম্‌নির মাঝখানে থাকে। জলের জন্য

নীচ হইতে চিম্‌নিতে বায়ু প্রবেশ করে না। প্রয়োজনীয় অম্লজানের অভাবে বাতি অল্পক্ষণের মধ্যেই নিবিয়া যায়। মোমবাতিটি

শীতল বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিতেছে।
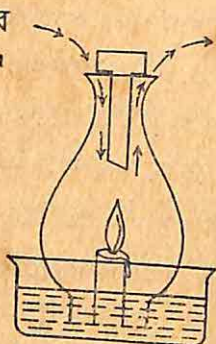
উত্তপ্ত বায়ু ও দহনে উদ্ভূত উত্তপ্ত গ্যাসগুলি বাহির হইয়া যাইতেছে।

৩১নং চিত্র—গ্যাসীয় পদার্থের পরিচলন পরীক্ষা

পুনরায় জ্বাল ও চিম্‌নির মুখে মাঝামাঝি একটি T আকারের মোটা কার্ডবোর্ড বা ধাতুপাত রাখ। লক্ষ্য করিয়া দেখ, মোমবাতিটি জ্বলিতেছে। ইহার কারণ কি ? কার্ডবোর্ড বা ধাতুপাত চিম্‌নির উপর অংশকে দুইভাগে ভাগ করে ; একভাগ দিয়া বাহিরের শীতল বায়ু প্রবেশ করে ও অপর ভাগ দিয়া উত্তপ্ত বায়ু ও দহনক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত উত্তপ্ত গ্যাসগুলি বাহির হইয়া যায়। একখণ্ড ধূমায়িত কাগজ (smouldering paper) চিম্‌নির উপরে কার্ডবোর্ডের বা ধাতুপাতের একপার্শ্বে ধরিলে উহার ধূম পরিচলন-প্রবাহের সহিত বাহিত হইয়া প্রবাহের পথ নির্দ্দেশ করিবে।

তাপের পরিচলন কঠিন পদার্থে সম্ভব নয় ; কারণ কঠিন পদার্থের অণুগুলি পরিচলন প্রণালীর পদার্থের অণুগুলির ন্যায় চলাফেরা করিতে পারে না।

বায়ুচলন (Ventilation) :—কোন স্থানের উষ্ণ, আর্দ্র ও বদ্ধ বায়ুর পরিবর্ত্তে শীতল, শুষ্ক ও প্রবাহমান বায়ু প্রবেশ করার নাম বায়ুচলন। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে গৃহমধ্যে বায়ুচলন হইতে পারে। বায়ুপ্রবাহ স্বাভাবিক বায়ুচলনের প্রধান উপায়।

[বায়ুমণ্ডলে নানা কারণে উষ্ণতার ও আর্দ্রতার পার্থক্য হয়। উষ্ণ ও বাষ্পপূর্ণ বায়ু হাল্কা; সুতরাং উহা উপরে উঠিয়া যায় এবং তাহার স্থানে শীতল ও শুষ্ক বায়ু আসিয়া স্থান দখল করে। এইরূপে প্রকৃতিতে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়; যথা স্থল বায়ু, জল বায়ু ইত্যাদি।]

বায়ুপ্রবাহ একদিক দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং গৃহের মন্দ বায়ুকে চুষিয়া টানিয়া লইয়া অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়। প্রবাহ যখন থাকে না তখন এই উপায়ে বায়ুচলন সম্ভবপর নহে। পরিচলন-স্রোত কাজে লাগাইয়া কৃত্রিম উপায়ে গৃহমধ্যে বায়ুচলন করা যায়। যদি গৃহে রুজু রুজু দরজা-জানালা রাখা যায় এবং ছাদের নীচে দেওয়ালের মাথায় বায়ু নির্গমনের জন্য কতকগুলি ঘুলঘুলি রাখা যায়, তবে গৃহের উত্তপ্ত বায়ু ঘুলঘুলি দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে এবং বাহিরের শীতল বায়ু দরজা-জানালা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে
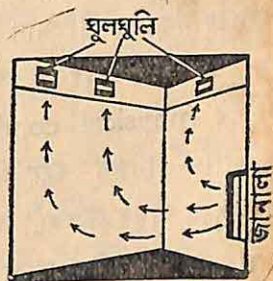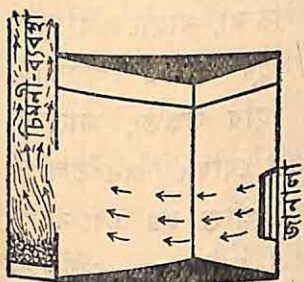
৩২নং চিত্র—কৃত্রিম উপায়ে বায়ুচলন ব্যবস্থা

পারে। শীতপ্রধান স্থানে অনেক সময় দরজা-জানলা খুলিয়া রাখার সুবিধা হয় না; আবার গৃহ গরম করার জন্য চুল্লী রাখিতে হয়। এইরূপ স্থানে গৃহের মেঝের নিকট দেওয়ালে ঘুলঘুলি থাকে এবং চুল্লীর উপর চিম্নী থাকে। চুল্লীর চিম্নীর ভিতর দিয়া উত্তপ্ত বায়ু ও দহনে উদ্ভূত উত্তপ্ত গ্যাসগুলি বাহির হইয়া যায় এবং মেঝের নিকট দেওয়ালের ঘুলঘুলি দিয়া বাহিরের শীতল বায়ু গৃহে প্রবেশ করে।

রন্ধনগৃহে বায়ুচলন ব্যবস্থা উন্নত ধরণের হওয়া উচিত কারণ রন্ধনগৃহে বায়ু শীঘ্রই দূষিত হইয়া পড়ে। রন্ধনগৃহে চিম্নীর ব্যবস্থা থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা।

বায়ুচলনের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Ventilation) :— জনবহুল ও রুদ্ধগৃহে আমরা অস্বস্থি বোধ করি। ইহার কারণ সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও লোকের সঠিক ধারণা ছিল না। পূর্ব্বে মনে করা হইত যে, শ্বাসক্রিয়ার ফলে জনবহুল ও রুদ্ধগৃহের বায়ুতে অম্লজানের হ্রাস ও অঙ্গারাম্লের আধিক্য হয় এবং এই দূষিত বায়ু (বায়ুর উপাদানের সাধারণ মানের তারতম্যের দরুণ বায়ুকে দূষিত বলা হইতেছে) হইতে শ্বাসক্রিয়া করার দরুণ আমরা অস্বস্থি বোধ করি। যাহাতে রুদ্ধগৃহের বায়ুতে বায়ুর উপাদান-গুলির এইরূপ তারতম্য না হয়, তাহার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ বায়ুচলন ব্যবস্থা। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, রুদ্ধগৃহের বায়ুর উপাদানগুলির পরিমাণ এমন অবস্থায় পৌঁছায় না, যাহাতে বায়ুকে দূষিত বলা যায়। আধুনিক মতে বায়ুর ভৌত অবস্থার উপর (physical conditions)—যেমন ইহার উষ্ণতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি—নির্ভর করে আমাদের স্বস্থি-অস্বস্থি বোধ। জনবহুল ও রুদ্ধগৃহে বায়ুর উষ্ণতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ফলে আমাদের দেহের তাপ অপসরণে অসুবিধা ঘটে এবং সেইজন্য আমরা অস্বস্থি বোধ করি। গৃহমধ্যে যাহাতে বায়ুর ভৌত অবস্থা নির্দ্দিষ্ট মানের মধ্যে থাকে, সেইজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ বায়ুচলন ব্যবস্থা। বায়ুচলন দ্বারা উষ্ণ, আর্দ্র বায়ু গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায় এবং তাহার স্থানে বাহিরের শীতল, শুষ্ক বায়ু প্রবেশ করে।

তাপের বিকিরণ (Radiation) :—**যে প্রক্রিয়া দ্বারা তাপ কোন মাধ্যমের ভিতর দিয়া আসিবার সাহায্য না লইয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে সঞ্চালিত হয়, তাহাকে বিকিরণ বলে।**

পরিবহন অথবা **পরিচলন** প্রণালীতে তাপের সঞ্চালন প্রধানতঃ কোন বস্তু মাধ্যমের সাহায্যে (through a material medium) সংঘটিত হয়। কিন্তু জ্বলন্ত উনুনের কাছে বসিলে

উত্তাপ গায়ে আসিয়া লাগে। সূর্য্য হইতে যে প্রচণ্ড উত্তাপ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার খানিকটা মাত্র পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিতেছে। উত্তপ্ত বস্তু হইতে এই যে তাপ সঞ্চালন, ইহা কিরূপে হইতেছে? তোমরা হয়ত বলিবে, বাতাসের দ্বারা তাপ উনুন ও সূর্য্য হইতে চালিত হইতেছে। কিন্তু তাহা নহে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে আছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর মাত্র তিনশত মাইলের অধিক দূরত্ব পর্য্যন্ত বাতাস আছে; তাহার পর মহাশূন্য। এই মহাশূন্যের ভিতর দিয়া সূর্য্যের তাপ কিরূপে পৃথিবীতে আসিতেছে? পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে **ইথার** (ether) নামক একটা জিনিস সমস্ত জগতকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে। এই ইথার দেখা, স্পর্শ করা বা তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা কিছুই সম্ভব নয়। উত্তপ্ত বস্তুমাত্রেই এই ইথার সমুদ্রে এক প্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সেই তরঙ্গ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে তাহাকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। উত্তাপের এই প্রকার সঞ্চালনকে **বিকিরণ** বলে। **বিকিরণের বিশেষত্ব এই যে, বিকির্ণ উত্তাপরশ্মি যাহার মধ্য দিয়া আসে তাহাকে উত্তপ্ত করে না; যে বস্তুতে বাধা পায় তাহাকেই উত্তপ্ত করে।** সূর্য্য তাপ বিকিরণ করে; কিন্তু সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছিবার পথে মধ্যবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে না।

তাপ বিকিরণের দৃষ্টান্ত (Practical observations on radiation) :—

সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করিলেও বিকিরণ প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা নিত্য সূর্য্যের তাপ পাইয়া থাকি। দিবাভাগে সূর্য্যের বিকীর্ণ তাপে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। আবার রাত্রে যখন সূর্য্য তাপ দেয় না তখন সঞ্চিত তাপ ভূপৃষ্ঠ বিকিরণ করে এবং গভীর রাত্রে ভূপৃষ্ঠ শীতল হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় টিনের ঘরে বাস করা কঠিন; কিন্তু

রাত্রিতে সঞ্চিত তাপ টিন হইতে বিকীর্ণ হইয়া যায় বলিয়া ঘর আবার বেশ ঠাণ্ডা হয়। কোন উত্তপ্ত পদার্থ কতটুকু তাপ বিকিরণ করিবে, তাহা নির্ভর করে চারিদিকের বস্তু হইতে উহা কত বেশী গরম তাহার পরিমাণের উপর। **আবার সকল বস্তুর তাপ বিকিরণ করিবার কিংবা বিকিরিত তাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সমান নহে।** যে সকল জিনিসের রঙ কালো এবং যাহাদের পৃষ্ঠদেশ অমসৃণ, তাহাদের তাপ বিকিরণ অথবা বিকিরিত তাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বস্তুটি যদি সাদা হয়, তবে উহার বিকিরণ করিবার অথবা বিকিরিত তাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কালো বস্তু অপেক্ষা অনেক কম। এজন্য গরম চা সাদা চায়ের বাটিতে রাখা হয়—কারণ সাদা কাপ হইতে চায়ের তাপ খুব তাড়াতাড়ি বিকিরিত হইতে পারে না। আবার কালো পাথরবাটিতে গরম দুধ খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। এই একই কারণে শীতকালে লোকে কালো জামা ব্যবহার করে, কেননা উহার তাপ গ্রহণের ক্ষমতা বেশী অথচ তাপ বিকিরণ কম করে বলিয়া শরীরের তাপ বজায় থাকে।

থার্ম্মোফ্লাস্ক (Thermos flask) :—এই জিনিসটি তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহাতে কোন উত্তপ্ত বস্তু রাখিলে—যেমন গরম দুধ, চা ইত্যাদি—উহা অনেকক্ষণ গরম অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ ভিতরের উত্তাপ যাহাতে পরিবহন, পরিচলন অথবা বিকিরণ প্রক্রিয়া দ্বারা বাহিরে আসিয়া ভিতরের উত্তাপ কমাইয়া না দেয় তাহার ব্যবস্থা এই জিনিসে করা হয়। তাপ পরিচলন বন্ধ করিবার জন্য কাচের পাত্রটি দুইটি বিভিন্ন স্তরে (ক, খ) নির্ম্মিত করা হয় এবং উহাদের মধ্যস্থল বাত পাম্পযোগে বায়ুশূন্য (vacuum) করা হয়। ঐ স্থানে বায়ু নাই বলিয়া পরিচলন প্রক্রিয়ার দ্বারা ভিতরের তাপ বাহিরে আসিতে

পারে না। পাত্রটির দুইটি কাচের স্তর পরিষ্কার, সংযুক্ত এবং সম্মিলিত। ঐ কাচ পাত্রটির মুখ একটি মোটা কর্ক দ্বারা আবদ্ধ এবং সমগ্র পাত্রটি একটি কর্কের গদির উপর অবস্থিত। ইহাতে তাপ পরিবাহিত খুবই কম হয়। কাচ পাত্রটির অভ্যন্তরস্থ তলদ্বয় খুব চকচকে (polished) বলিয়া ভিতরের তাপ পুনঃপুনঃ প্রতিফলিত হইয়া ভিতরেই থাকিয়া যায়, বাহিরে বিকিরিত হইতে খুবই কম পারে। এক্ষণে এরূপ পাত্রে গরম দুধ বা চা রাখিলে উহার তাপমাত্রার অনেকক্ষণ কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। এই সমগ্র কাচপাত্র ও নীচের ও মুখের কর্কের অংশ একটি ধাতুনির্ম্মিত আধারের ভিতর বসান থাকে।

৩৩নং চিত্র—থার্ম্মোফ্লাস্ক
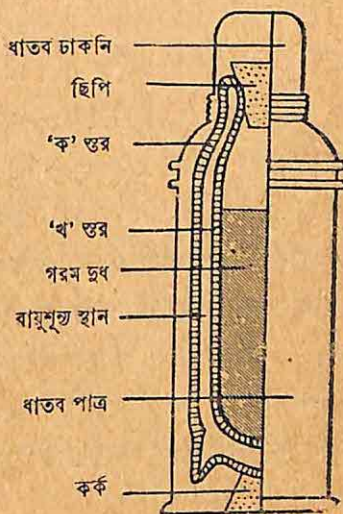
অনুশীলন

১। তাপ সঞ্চালনের বিবিধ পদ্ধতিগুলি বর্ণনা কর।

২। গ্যাসীয় পদার্থের পরিচলন সম্বন্ধে আলোচনা কর। তাপের পরিচলন কঠিন পদার্থে সম্ভব নয় কেন?

৩। বায়ুচলন বলিতে কি বুঝ? বায়ুচলনের প্রয়োজনীয়তা কি?

৪। থার্ম্মোফ্লাস্কের বর্ণনা দাও।

নবম অধ্যায়

আলোক ; বিকীর্ণ শক্তি ; সালোকসংশ্লেষ

আলোক (Light) :—দর্শন অনুভূতির জন্য দুইটি বস্তুর প্রয়োজন—প্রথম চক্ষু ও দ্বিতীয় আলোক। যে কোন একটির অভাবে সমস্ত অন্ধকার। **যে বাহ্যিক কারণে আমাদের চক্ষুতে দর্শন অনুভূতি জাগ্রত হয়, তাহাকে আলোক বলে।** আলোক এক প্রকার শক্তি কারণ অন্য প্রকার শক্তি হইতে আমরা আলোক পাইয়া থাকি এবং আলোককে অন্য প্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। পরে তোমরা দেখিবে, কোন উত্তপ্ত পদার্থ হইতে বহির্গত দৃশ্য বিকীর্ণ শক্তি হইতেছে আলোক (Light is visible radiant energy)।

আলোক অদৃশ্য (Light is invisible) :—সমস্ত শক্তির ন্যায় আলোক সম্পূর্ণ অদৃশ্য। আমরা আলোক দেখি না ; আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত পদার্থ দেখি। ধূলিশূন্য ঘরের কোন ছোট ছিদ্র দিয়া সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে দিলে রশ্মির পথ দেখা যায় না। যদি ঘরে ধূলিকণা উড়াইয়া দেওয়া হয় তবে ধূলিকণা হইতে বিক্ষিপ্ত আলোকে আমরা ধূলিকণা দেখিতে পাই।

আলোকের উৎস (Sources of light) :—সূর্য্য-তারকাদি জ্যোতিষ্ক, উত্তাপ, তড়িৎ ও রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। কতকগুলি পদার্থ (ফস্‌ফরাস্, বেরিয়াম সাল্‌ফাইড, ক্যাল্‌সিয়াম সাল্‌ফাইড) এবং কতকগুলি প্রাণী—জোনাকী পোকা, কয়েক জাতীয় সামদ্রিক মৎস্য ও জীবাণু—তাহাদের দেহ হইতে আলোক উৎপন্ন করে।

আলোকের স্বরূপ (Nature of Light) :—অতি প্রাচীন-

কাল হইতে পণ্ডিতেরা আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। একদল বৈজ্ঞানিকের ধারণা ছিল, আলোক অসংখ্য ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টি। দৃশ্যমান কোন দীপ্তময় পদার্থ অথবা সূর্য্য হইতে ঐ ক্ষুদ্র কণিকাগুলি চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া গ্যাসীয়, স্বচ্ছ তরল ও কঠিনের সমসত্ত্ব মাধ্যমে এবং রিক্ত স্থানের ভিতর দিয়া তীব্র গতিতে (প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল) সরল রেখায় আসিয়া **অক্ষিপটের** (retina) উপর ধাক্কা দেয় এবং ফলে আমরা উহাদিগকে দেখিতে পাই। এই মতবাদ **আলোক কণিকাবাদ** (Corpuscular Theory of Light) নামে পরিচিত। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক **নিউটন** (Newton) এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতবাদ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-জগতে আদর পাইয়াছিল কিন্তু পরে দেখা গেল যে, ইহা আলোক সম্বন্ধে অনেক তথ্য ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ নহে।

আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে ডাচ্ বৈজ্ঞানিক **হায়গেন্সের** (Huyghens) মতবাদ এখন অনেকটা বিজ্ঞানসম্মত। এই মত অনুসারে প্রত্যেক দীপ্ত পদার্থের একটা আণবিক কম্প আছে। সেই কম্পের বেগ চতুর্দ্দিকের ইথার*-সমুদ্রে বড়-ছোট নানা প্রকার তরঙ্গের সৃজন করে। দীপ্ত পদার্থের চতুর্দ্দিকে সেই গোলীয় (spherical) তরঙ্গরাজি অতি দ্রুতবেগে (প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল) বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অপেক্ষাকৃত বড় তরঙ্গগুলি কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিল উহারা উত্তপ্ত হয়, আমাদের দেহ স্পর্শ করিলে আমরা গরম অনুভব

---

*এই ইথার জল, স্থল, বায়ুর মধ্যে, এমন কি মহাশূন্যের মধ্যেও বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান। ইহা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক, ভারহীন ও ইন্দ্রিয়াতীত। ইথারের অস্তিত্ব আছে কি নাই তাহা আজ পর্য্যন্তও প্রমাণিত হয় নাই। ইহা বিজ্ঞানীদের একপ্রকার মানস-সৃষ্টি। ইথারকে মানিয়া লইলে বিকীর্ণ শক্তির অনেক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা সহজ হইয়া যায়।

করি। কিন্তু ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি দ্রব্যসামগ্রীর উপর পড়িয়া আলোকরূপে প্রতিভাত হয়; আমাদের চোখে প্রবেশ করিয়া দৃষ্টির অনুভূতি জন্মায়। এই মতবাদ **আলোক তরঙ্গবাদ** (Wave Theory of Light) নামে পরিচিত। আলোক কণিকাবাদ আলোক সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় নাই তাহা আলোক তরঙ্গবাদ সুষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করিল।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক **ম্যাক্সওয়েল** (Maxwell) গাণিতিক কারণ বশতঃ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আলোক তরঙ্গ তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। পরে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক **হার্জ্জ** (Hertz) পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ আলোক তরঙ্গকে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ মনে করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিক **প্ল্যাঙ্ক** (Plank) বিবিধ পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করিলেন যে, তাপশক্তির বিকিরণ ও শোষণ একটানা ধারাবাহিকভাবে ঘটে না—বিচ্ছিন্নভাবে খণ্ডে খণ্ডে ঘটে। ইহাই **কোয়ান্টমবাদ** (Quantum Theory) নামে পরিচিত। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক **আইনষ্টাইন** (Einstein) এই মতবাদ গ্রহণ করিলেন এবং আলোক শক্তি ও অন্যান্য বিকীর্ণ রশ্মির বেলায় যে ইহা প্রয়োজ্য তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আলোক সম্বন্ধে কতকগুলি ঘটনার মীমাংসা করিতে প্রয়োজন তরঙ্গবাদের এবং কতকগুলির জন্য প্রয়োজন কণিকাবাদের অর্থাৎ বিকীর্ণশক্তির দ্বৈতভাব—তরঙ্গ ও কণিকা—স্বীকার করিতে হয় এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহাই মানিয়া লইয়াছেন।

বিকীর্ণ শক্তি (Radiant Energy):—ইথার তরঙ্গের মাধ্যমে যে শক্তি পরিচালিত হয় তাহাকে **বিকীর্ণ শক্তি** বলে। সমুদ্রে বা নদীবক্ষে যেমন ছোট-বড় তরঙ্গ উত্থিত হয় তেমনি ইথার-সমুদ্রে

ছোট-বড় তরঙ্গ উত্থিত হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (wave length) উপর বিকীর্ণ শক্তির প্রকৃতি নির্ভর করে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যখন ·০০০০৪ সেঃ মিঃ হইতে ·০০০০৭ সেঃ মিঃ মধ্যে থাকে তখন বিকীর্ণ শক্তি আলোকশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। শ্বেত আলোক বিভিন্ন বর্ণের আলোকের সমষ্টি। বিভিন্ন বর্ণের আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। লাল আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ·০০০০৭ সেঃ মিঃ। বেগুনি আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ·০০০০৪ সেঃ মিঃ। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যখন আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হইতে কম হইতে থাকে তখন আমরা ক্রমশঃ অতি বেগুনি (ultra violet), এক্স-রশ্মি (X-ray), গামা-রশ্মি (Gamma ray), নভোরশ্মি (Comsic ray) ইত্যাদি অঞ্চলে আসিয়া পড়ি। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যখন ·০০০০৮ সেঃ মিঃ হইতে ·০৩২ সেঃ মিঃ মধ্যে থাকে অর্থাৎ আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে কিছু বেশী হয় তখন বিকীর্ণ শক্তি তাপশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যখন তাপশক্তির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বাড়িতে থাকে তখন ক্রমশঃ আমরা রেডার (Radar), টেলিভিসন (Television), রেডিও (Radio) ইত্যাদিতে যে সমস্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ব্যবহার হয় সেই সমস্ত অঞ্চলে আসিয়া পড়ি। বিকীর্ণ তাপশক্তি ও আলোকশক্তি বিকীর্ণ শক্তির একটি অংশ মাত্র।

সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis) :—অধিকাংশ উদ্ভিদের **ক্লোরোফিল** (chlorophyll) আছে। উদ্ভিদের ক্লোরোফিল সূর্য্যালোকে উহার খাদ্য শর্করা (carbohydrate) জল ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস হইতে প্রস্তুত করে। ইহাকে **সালোকসংশ্লেষ** বা **অঙ্গার আত্মীকরণ** ক্রিয়া বলে। পরে এই সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব।

অনুশীলন

১। আলোক কি? ইহার স্বরূপ বর্ণনা কর।

২। বিকীর্ণ শক্তি বলিতে যাহা বুঝ তাহা বিশদভাবে বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

জীব ও জড়ঃ উদ্ভিদ্ ও প্রাণী সম্বন্ধীয় সাধারণ আলোচনা

সমগ্র বিশ্বকে মোটামুটি দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রাণহীন **জড়জগৎ** ও প্রাণময় **জীবজগৎ**। ইট, কাঠ, কয়লা, পাথর, মাটি, জল, বায়ু, ধাতুদ্রব্য, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি অচেতন (প্রাণহীন) পদার্থ জড়জগতের অন্তর্ভুক্ত। কীট, পতঙ্গ, ঝিনুক শামুক, পশু, পক্ষী, মৎস্য, শৈবাল, ছত্রক, বৃক্ষ ইত্যাদি চেতন (প্রাণময়) পদার্থ জীবজগতের অন্তর্ভুক্ত। জীবজগৎ বলিতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীকে বুঝায়। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর প্রাণ আছে, সেইজন্য ইহাদের সজীব বলা হয়। প্রাণ যে কি বস্তু তা সঠিকভাবে বলা কঠিন ; তবে জীবের কতকগুলি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে যাহা জড়ের নাই এবং পণ্ডিতগণ ঐ সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতেই জীব ও জড়ের মধ্যে সীমারেখা টানিয়াছেন।

জীবদেহের উপাদান :—জীবদেহের প্রধান উপাদান হইল **কোষ**। নগ্নচক্ষে ইহাদের দেখা যায় না। **অণুবীক্ষণিক** পরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রত্যেক কোষ যেন এক একটি থলি বিশেষ। এই থলির ভিতর জেলির ন্যায় একপ্রকার অর্দ্ধতরল (কতকটা স্বচ্ছ) বস্তু আছে, তাহার নাম **প্রোটোপ্লাজম্**। ইহাই কোষের সারবস্তু। জীবনের সকল কার্য্যই ইহার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। প্রোটো-প্লাজমের মধ্যে **নিউক্লিয়স্** নামে উহার একটি ঘন অংশ থাকে। নিউক্লিয়স্ প্রোটোপ্লাজমের শাসনকেন্দ্র। জীবদেহের একটি কোষকে যদি এরূপভাবে বিভক্ত করা যায় যে একটি ভাগে নিউক্লিয়স্ থাকে এবং অপরটিতে থাকে না, তাহা হইলে দেখা যায়, যে ভাগে নিউক্লিয়স্ নাই তাহা মরিয়া যায় এবং যে ভাগে নিউক্লিয়স্

থাকে তাহাতে প্রাণের লক্ষণ দেখা যায়। যে কোন উদ্ভিদ্-কোষ বা প্রাণী-কোষ আমরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করি না কেন, তাহার মধ্যে প্রোটোপ্লাজম্ ও নিউক্লিয়স্ অতি অবশ্যই থাকিবে। কোষের আরও অন্যান্য জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। উদ্ভিদ্-কোষে
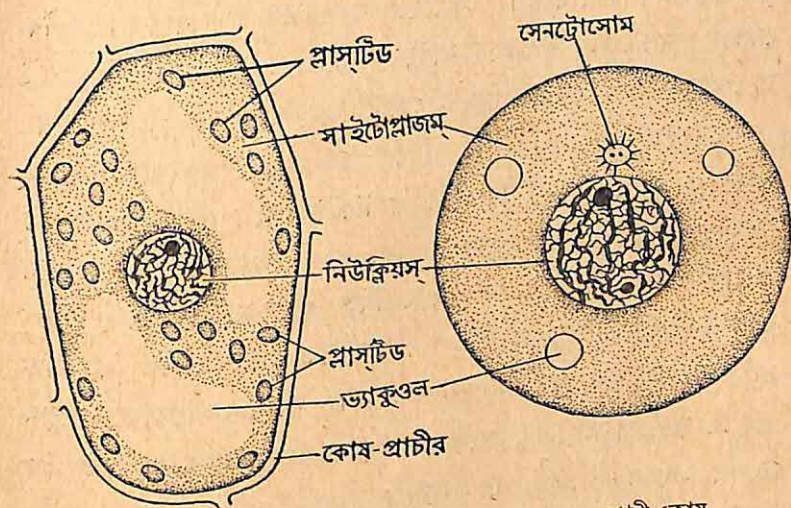
উদ্ভিদ্-কোষ ৩৪নং চিত্র প্রাণী কোষ

আছে প্লাস্টিড (Plastids), ভ্যাকুওল (Vacuole) ইত্যাদি। প্রাণী-কোষে আছে সেনট্রোসোম (Centrosome), ভ্যাকুওল (প্রাণী-কোষের ভ্যাকুওল বেশ ছোট হয়) ইত্যাদি। প্রোটোপ্লাজমের ঘন অংশগুলি ব্যতীত স্বচ্ছ অংশকে **সাইটোপ্লাজম্** বলে। জীবের জটিল দেহ এইরূপ বহুসংখ্যক কোষদ্বারা রচিত। প্রত্যেক জীবকোষটির স্বতন্ত্র জীবন আছে। ইহা স্বতঃই চঞ্চল, বাহির হইতে দেহের উপাদান সংগ্রহ করে, পরিত্যক্তাংশ বাহির করিয়া দেয় এবং খণ্ডিত হইয়া অপর নূতন কোষের উৎপত্তি করিয়া থাকে। এইরূপে বৃহৎ এবং জটিল জীবদেহের গঠন হয়।

এখন দেখা যাক, জীবদেহের এই **প্রাণময় এককটির** উপাদান

কি ? ইহা মৌলিক পদার্থ না যৌগিক পদার্থ। রাসায়নিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে, জীবকোষ যৌগিক পদার্থ। অঙ্গার, উদজান, অম্লজান, সোরাজান, গন্ধক, ফস্‌ফরাস্‌, পোটাসিয়াম ক্যাল্‌সিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, লৌহ প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ সকল জীবকোষের উপাদান। ইহাদের সবগুলিই জড় পদার্থ। জীব-কোষে এমন কোন উপাদান নাই, যাহা জড়বস্তু নয়। কিন্তু এই উপাদানগুলি জীবকোষের মৃত প্রোটোপ্লাজম্‌ হইতে পাওয়া যায় ; কারণ রাসায়নিক পরীক্ষা করিতে হইলে জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম্‌ মরিয়া যায়। এই কারণে সজীব প্রোটোপ্লাজমে এই উপাদানগুলি কিভাবে মিশ্রিত থাকে এবং উহারা ছাড়া আর কোন উপাদান আছে কিনা তাহা এখনও বিশ্লেষিত হয় নাই। রাসায়নিক তাঁহার বিজ্ঞানাগারে মৌলিক পদার্থ হইতে প্রয়োজনমত শত শত যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তির সাহায্যে তিনি মৌলিকের সমন্বয় ঘটাইয়া যৌগিকের উৎপন্ন করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি প্রোটোপ্লাজম্‌ নামক যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন নাই। অবশ্য বৈজ্ঞানিক **উহ্লার** অজৈব পদার্থ হইতে জৈব পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং শীঘ্র হয়তো এমন দিন আসিবে যখন বিজ্ঞানীরা প্রোটোপ্লাজম্‌ নামক যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাহাতে জীবনের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইবে। সেরূপ অবস্থাতেও জীব ও জড়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এমন কথা বলা সঙ্গত হইবে না। সৃষ্টির বহু পরেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। অনুমান করা হয়, অতীত যুগে ধরাতলে যখন প্রথম জীবের উৎপত্তি হয়, তখন তথায় শীতাতপের অবস্থা ছিল অন্যরূপ ; সেই অবস্থায় মৌলিক জড়পদার্থের সমন্বয়ে সৃষ্ট বস্তুর মধ্য দিয়াই জীবনীশক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল ও জীবের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। বিজ্ঞানী যদি

বিজ্ঞানাগারে এইরূপ যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন যাহাতে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায় (অতীত যুগে প্রাকৃতিক শক্তির ফলে যাহা সৃষ্ট হইয়াছিল), তাহা হইলে আমরা বলিব বিজ্ঞানীরা প্রাণ সৃষ্টি করেননি ; জীবনীশক্তি প্রকাশিত হইবার মাধ্যম সৃষ্টি করিয়াছেন।

জীবনের লক্ষণ :—মূল উপাদানে জীব ও জড়দেহে কোন প্রভেদ আছে কিনা তা বিজ্ঞানীরা আজও পর্য্যন্ত জানিতে সমর্থ হন নাই। যদি পরবর্ত্তীকালে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে, মূল উপাদানে ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই তাহা হইলে জীবের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখিয়াই জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হইবে। আমরা এখন জীবের সেই প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিব।

১। **গমনশক্তি**—গমনশক্তির অর্থ নড়াচড়া করা। জীব-মাত্রেরই নড়াচড়া আছে। উদ্ভিদ্ সারা দেহ একসঙ্গে নাড়িতে না পারিলেও উহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দিকে চালিত হয়। ইহা মূলকে ভূগর্ভে আর শাখা-প্রশাখাকে উপরে আলোকের দিকে প্রসারিত করে। সূর্য্যমূখী ফুল আকাশে সূর্য্যের স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে। প্রাণিগণের মধ্যে কতকগুলি যেমন কেঁচো প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে একস্থান হইতে অন্যত্র যায়। মাছ ডানার সাহায্যে, পতঙ্গ ও পক্ষী পাখা ও পায়ের সাহায্যে এবং উচ্চতর প্রাণী কেবলমাত্র পা দিয়া চলাফেরা করে। **জড়দেহে গমনশক্তি নাই** অর্থাৎ আপনা হইতে চলিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই।

২। **শ্বাসক্রিয়া**—জীবের আর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য শ্বাসক্রিয়া। প্রশ্বাসকার্য্যে বাহিরের বাতাস জীবদেহে প্রবেশ করে। জীব তাহা হইতে অম্লজান গ্যাস গ্রহণ করে এবং নিশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় যে বায়ু পরিত্যাগ করে তাহাতে অঙ্গারাম্লর পরিমাণের

আধিক্য হয়। বিশেষ যন্ত্র না থাকিলেও উদ্ভিদ্ পত্র, ত্বক্ এমন কি সর্ব্বদেহ দ্বারা শ্বাস লয়; জলচর প্রাণী ফুল্কোর সাহায্যে জল হইতে অম্লজান লয়; উচ্চ শ্রেণীর প্রাণিগণ ফুস্‌ফুস্ সাহায্যে প্রশ্বাস গ্রহণ করে। যে সব নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর ফুল্কো বা ফুস্‌ফুস্ নাই তাহারা দেহের ত্বক্ ও বিভিন্ন বস্তুর দ্বারা শ্বাসকার্য্য চালায়। **জড়দেহের শ্বাসকার্য্য নাই, উহার প্রয়োজনীয়তাও নাই।**

৩। **পুষ্টি**—জীবমাত্রই খাদ্য গ্রহণ দ্বারা দেহ পুষ্ট করে। উদ্ভিদ্ বায়ু ও মাটি হইতে নানা দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ঐ সকল উপাদান হইতে প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। প্রাণীরা তৈয়ারী খাদ্যই আহার করে। দেহের পুষ্টিসাধন ব্যতীত জীব বাঁচিতে পারে না **জড়জগতের পুষ্টি বলিয়া কিছুই নাই।**

৪। **দূষিত পদার্থ ত্যাগ**—জীবমাত্রই দেহের দূষিত পদার্থ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু জড়ের সে ক্ষমতা নাই।

৫। **উদ্দীপনায় সাড়া**—আঘাত, উত্তাপ, শৈত্য, তড়িৎ, আলোক, স্পর্শ প্রভৃতি দ্বারা জীবদেহে উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়া থাকে। উদ্দীপনা হইলে চাঞ্চল্যের দ্বারা জীবদেহ তাহাতে সাড়া দেয়। আঘাত করিলে কুকুর, বিড়াল, মানুষ প্রভৃতির দেহ সঙ্কুচিত হয় এবং জীব পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। তপ্ত জিনিসে হাত ঠেকিলে আমরা তৎক্ষণাৎ হাত সরাইয়া লই; শীতল বরফে হাত ঠেকিলেও সেইরূপ করিয়া থাকি। তড়িৎ স্পর্শে মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয় এবং যন্ত্রণার অনুভূতি জন্মে। উদ্দীপনা প্রবল হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। সূর্য্যালোকের সংস্পর্শে গাছের পাতার ছিদ্রগুলি খুলিয়া যায়, আলোকানুভূতির ফলে গাছের মাথা আলোকের দিকে প্রসারিত হয়। **জড়দেহে এই সকল উদ্দীপনার বা তজ্জনিত কোন সাড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় না।**

৬। **প্রজনন বা বংশবিস্তার**—বংশবিস্তার এবং যতকাল সম্ভব

বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম। বংশবিস্তার না করিতে পারিলে জীব অচিরেই পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে। উদ্ভিদ্‌জগতে বংশবিস্তারের নানারূপ কৌশল দেখা যায়। নারিকেল ফল সমুদ্রজলে ভাসিতে ভাসিতে এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে গিয়া তাহার বংশবিস্তার করে। চোরকাঁটার বীজগুলি গরু-বাছুরের গায়ে লাগিয়া স্থানান্তরে গিয়া পড়ে এবং সেখানে সেই বীজ হইতে নূতন গাছ জন্মিয়া থাকে। তিল, দোপাটি প্রভৃতির ফলগুলি পাকিলে ফাটিয়া যায় এবং বীজগুলি সজোরে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। অনুকূল অবস্থায় সেই বীজগুলি হইতে আবার নূতন গাছ জন্মে। **জড়বস্তুর বংশবিস্তারের কোন রীতি নাই।**

৭। **পরিপার্শ্বের সহিত অভিযোজন**—পরিপার্শ্বের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা না করিতে পারিলে জীবনযাত্রা চলে না। সেইজন্য জীব যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পতিত হয়, সে তাহার দেহ, আচরণ, আহার্য্য প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া সেই অবস্থার অনুকূল করিয়া লয়। কিন্তু পরিপার্শ্বের সহিত **অভিযোজনের শক্তি জড়বস্তুর মধ্যে দেখা যায় না।** বড় হয়ে এ বিষয়ে তোমরা আরও পড়বে।

মৃত্যু—জীবমাত্রই জন্ম ও মৃত্যুর অধীন। তবে বিভিন্ন জীবের জীবনকাল নানা প্রকার। জীবমাত্রই জীবিতাবস্থায় উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে, কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটিলে আর পারে না। জীবের মৃত্যুতে উহার দেহ জড় পদার্থে পরিণত হয়। জড় পদার্থ সর্ব্বদাই প্রাণহীন, চেতনাহীন; **উহার মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই।**

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর তুলনা :—উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জীব জগতের অন্তর্ভুক্ত। উভয়ের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য আছে এবং কতকগুলি প্রভেদও রহিয়াছে। এই সকল প্রভেদ অনুসারে জীবকে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী এই দুই শাখাশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

সাদৃশ্য—উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়েরই দেহ কোষদ্বারা নির্ম্মিত।

জীবের নিম্নস্তরে যেমন এককোষ উদ্ভিদ্ আছে, তেমনিই এককোষ প্রাণীও রহিয়াছে। উভয়েরই জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। উভয়ের দেহেই শ্বাসকার্য্য প্রচলিত। তাহারা বাতাসের অম্লজান গ্রহণ করে ও অঙ্গারাম্ল পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উভয়েই বংশবৃদ্ধি ও বংশবিস্তার করে। নার্ভের সাহায্যে উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর দেহ বাহিরের উদ্দীপনা অনুভব করে এবং তাহাতে সাড়া দেয়। তাহাদের মস্তিষ্ক আছে। উদ্ভিদের দেহে মস্তিষ্কের সন্ধান পাওয়া যায় নাই বটে কিন্তু তাহারা বাহিরের উদ্দীপনায় সাড়া দিয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌দেহে এই কার্য্য প্রাণিদেহের মত স্পষ্ট না হইলেও তাহার অনেক লক্ষণ বর্ত্তমান। উদ্ভিদের প্রাণীদের ন্যায় গমনাগমন শক্তি না থাকিলেও উহারা প্রয়োজন অনুযায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত করিতে পারে।

প্রভেদ—উদ্ভিদ্-কোষের আবরণী আছে, প্রাণী-কোষের নাই। উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে; কয়েকটি নিম্নস্তরের প্রাণী ছাড়া অপরাপর প্রাণীর দেহে ক্লোরোফিল নাই। উদ্ভিদেরা তাহাদের দেহ হইতে অসার পদার্থ বাহির করিয়া দেয় অথবা দেহের কোন স্থানে রাখিয়া দেয়। প্রাণীরা দেহের দূষিত পদার্থ নিয়মিত ত্যাগ করিয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীরা দূষিত পদার্থ মল, মূত্র ও ঘর্ম্মরূপে বাহির করিয়া দেয়। উদ্ভিদেরা প্রত্যক্ষভাবে জড়জগৎ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে (পরে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাবে)। তরল ব্যতীত কঠিন দ্রব্য তাহারা খায় না। প্রাণী তাহার দেহের খানিকটা জল, লবণ ও অম্লজান গ্যাস ছাড়া আর কোন জিনিস জড়জগৎ হইতে গ্রহণ করিতে পারে না। প্রাণীরা উদ্ভিদ্‌দেহের অংশগুলি ভোজন করিয়া খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে। অবশ্য মাংসাশী প্রাণীরা অপর প্রাণীর দেহ ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা যে সব প্রাণীর মাংস খায়, তাহাদের রক্তমাংস উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে প্রস্তুত। উদাহরণস্বরূপ বাঘ, সিংহ প্রভৃতি

প্রাণীরা গরু, ছাগল প্রভৃতির মাংস খায়। কিন্তু গরু ও ছাগলের
মাংস তৃণখাদ্য হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং মাংসাশী প্রাণী
প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে তাহার আহার্য্যের জন্য
উদ্ভিদের কাছে ঋণী। ঝাঁঝি, রৌদ্র-শিশির, কলসবৃক্ষ প্রভৃতি
কয়েকটি উদ্ভিদ্ কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায়। ইহা অবশ্য সাধারণ
নিয়ম নহে। ইহা ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। চঞ্চলতার দিক দিয়া
প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। প্রাণীর চাঞ্চল্য বেশ স্পষ্ট
ও প্রবল। সে অতি সহজেই নড়াচড়া ও চলাফেরা করিতে পারে।
কয়েকটি উদ্ভিদের ঐ শক্তি স্পষ্ট। কীটভোজী ঝাঁঝি, রৌদ্র-শিশির
প্রভৃতি গাছের পাতাগুলি যখন কীটকে ধরে, তখন মুড়িয়া যায়।
লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিলে অথবা তাহার গায়ে ফুঁ দিলে
তৎক্ষণাৎ উহার পাতা ও ডালগুলি মুড়িয়া যায়।

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ :—পৃথিবীতে বহু প্রকারের উদ্ভিদ্ আছে।
তাহাদের পড়িবার ও জানিবার সুবিধার জন্য মোটামুটি দুই ভাগে
ভাগ করা হইয়াছে। যাহাদের ফুল ও বীজ হয় না তাহারা
অপুষ্পক উদ্ভিদ্ ; যেমন—ছাতা, শৈবাল, মস, ফার্ণ ইত্যাদি।
যাহাদের ফুল ও বীজ হয় তাহাদের **সপুষ্পক** উদ্ভিদ্ বলে ; যেমন—
আম, জাম, কাঁঠাল, ধান, গম, যব, গোলাপ ইত্যাদি। প্রাণিজগতে
স্তন্যপায়ীরা যেমন উচ্চশ্রেণীর প্রাণী তেমনি উদ্ভিদ্‌জগতে সপুষ্পক
উদ্ভিদ্ উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ্। অপুষ্পক উদ্ভিদ্‌কে প্রধানতঃ তিন
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—(১) **টেরিডোফাইটা বা ফার্ণবর্গ**—
ইহাদের **মূল, কাণ্ড ও পাতা** বিশেষভাবে পরিস্ফুট। যথা—ফার্ণ,
শুশনি শাক প্রভৃতি। (২) **ব্রাওফাইটা বা মসবর্গ**—ইহাদের কাণ্ড ও
পাতা আছে কিন্তু মূল নাই। যথা—মস। (৩) **থ্যালোফাইটা বা
সমাঙ্গদেহীবর্গ** :—ইহাদের **মূল, কাণ্ড ও পাতা** কিছুই সুনির্দ্দিষ্ট নয়,
সব অঙ্গ সমান। যথা—শেওলা, ব্যাঙের ছাতা, ছাতা (ভিজা জুতা,

পুরাতন চাটনির উপর সাদা রঙের যে ছাতা জন্মিতে দেখা যায়) প্রভৃতি। থ্যালোফাইটা বা সমাঙ্গীদেহীবর্গ উদ্ভিদ্‌কে আবার দুই-

সপুষ্পক উদ্ভিদ্ঃ পাইন (১), বিলাতী ঝাউ (২), ধান গাছ (৩), আম গাছ (৪)। (১, ২) নগ্নবীজ ও (৩, ৪) আবৃত বীজ ; (৩) একবীজপত্রী ও (৪) দ্বিবীজপত্রী।
অপুষ্পক উদ্ভিদ্ঃ ফার্ণ (৫), মস (৬), শেওলা (৭), বাঙের ছাতা (৮), ছাতা (৯)।
এককোষী অপুষ্পক উদ্ভিদ্ঃ উপরে ইয়েষ্ট ও নীচে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাক্টিরিয়া।
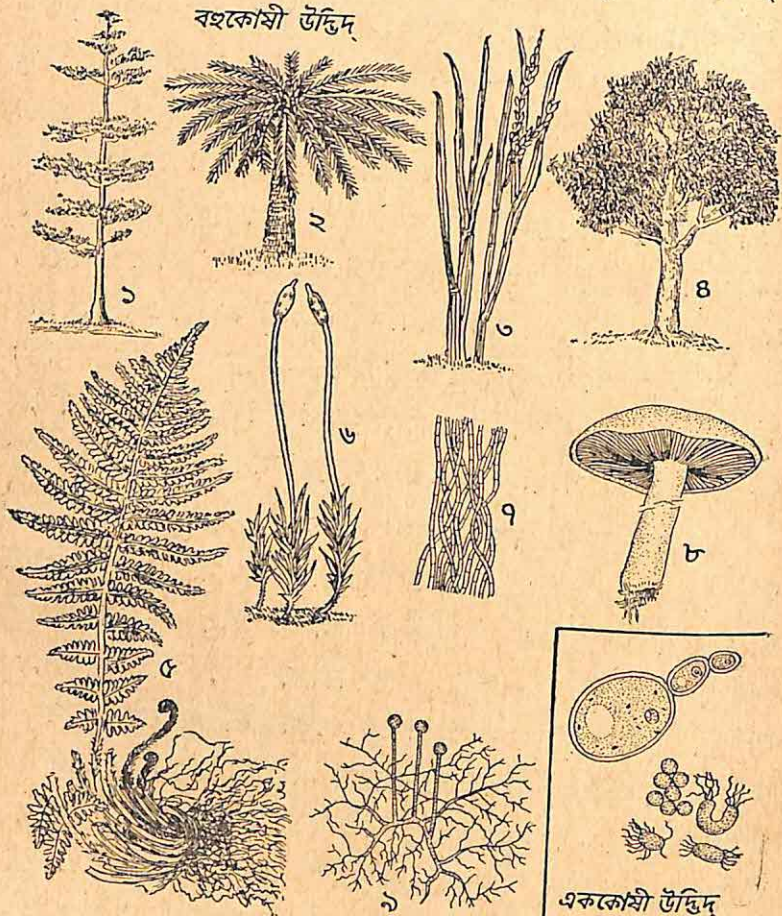
ভাগে ভাগ করা হয়ঃ—(ক) **শৈবাল** বা **শেওলা জাতীয়**—ইহারা দেখিতে সবুজ, কারণ দেহে সবুজকণা বা ক্লোরোফিল আছে।

(খ) **ছত্রক বা ছাতা জাতীয়**—ইহাদের দেহে সবুজকণা নাই। ইহারা সাধারণতঃ সাদা বা হরিদ্রাভ হয়।

অপুষ্পক উদ্ভিদের বীজ হয় না বলিয়া এক-কোষবিশিষ্ট অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি স্পোর দ্বারা বংশবিস্তার করে। অপুষ্পক উদ্ভিদ্‌কে আমরা মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছি। কিন্তু ইহা ছাড়াও অনেক অপুষ্পক উদ্ভিদ্ আছে যাহাদের নগ্নচক্ষে দেখা যায় না; অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে হয়। **ইয়েষ্ট** নামে এক প্রকার এক-কোষযুক্ত ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদ্ আছে। ইহারা খেজুর রসকে তাড়িতে পরিণত করে। **ব্যাক্‌টিরিয়া** নামে এক প্রকার এক-কোষযুক্ত উদ্ভিদ্ বর্ত্তমান। ইহারা আমাদের দেহের নানাস্থানে অবস্থান করিয়া উপকার ও অপকার দুইই করে।

সপুষ্পক উদ্ভিদের দুই শাখা :—(১) **নগ্নবীজ** ও (২) **আবৃত বীজ**। নগ্নবীজ উদ্ভিদের ফল হয় না। বীজ এক প্রকার পাতার উপর অনাবৃত অবস্থায় জন্মিয়া থাকে; যেমন পাইন, বিলাতী ঝাউ ইত্যাদি। আবৃত বীজ উদ্ভিদের ফুল হইয়া ফল হয় এবং উহার মধ্যে বীজ থাকে। আমরা সাধারণতঃ এই শ্রেণীর গাছই বেশী দেখিতে পাই। বীজের গঠন অনুসারে **আবৃত বীজ** উদ্ভিদ্‌কে দুই ভাগে ভাগ করা যায় :—(ক) **একবীজপত্রী** (বীজের খোসা ছাড়াইলে একটি মাত্র দানা পাওয়া যায়)—যেমন ধান, নারিকেল, গম, যব ইত্যাদি; (খ) **দ্বিবীজপত্রী** (বীজের খোসা ছাড়াইলে দুইটি পৃথক পৃথক মোটা দানা পাওয়া যায়)—যেমন মটর, ছোলা, আম ইত্যাদি।

প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ :—এই বৈচিত্র্যময় ধরাতলে অগণিত প্রাণী বাস করে। এই অগণিত প্রাণীদের মধ্যে কতকগুলি দৃশ্যমান; আমরা নগ্নচক্ষে তাহাদিগকে দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া কত যে সূক্ষ্মদেহ প্রাণী আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অণুবীক্ষণ তাহার

তীক্ষ্ণদৃষ্টির বলে তাহাদের সামান্য কতকগুলিকে মাত্র আবিষ্কার
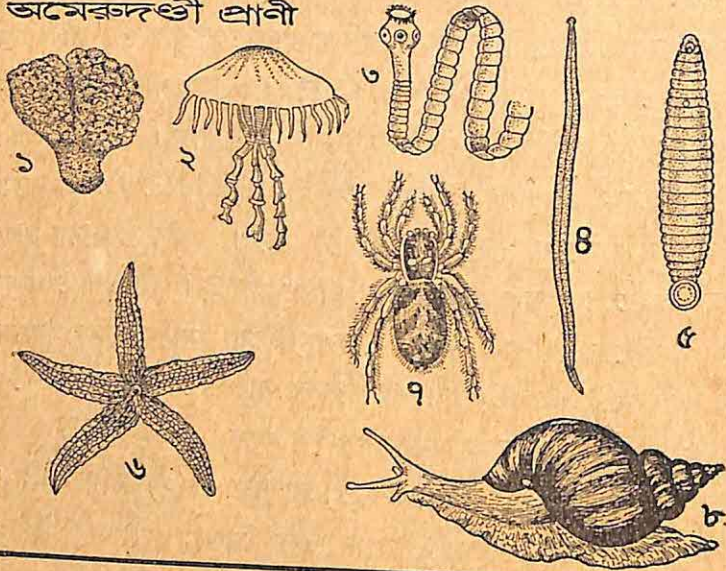
অমেরুদণ্ডী প্রাণী : স্পঞ্জ (১), জেলফিশ (২), যকৃৎকৃমি (৩), গোলকৃমি (৪), জোঁক (৫), তারা মাছ (৬), মাকড়সা (৭), শামুক (৮)।

মেরুদণ্ড প্রাণী : কুকুর (১), পক্ষী (২), মৎস্য (৩), কুমীর (৪), বাঙ (৫)। (১, ২)—উষ্ণ রক্ত-বিশিষ্ট প্রাণী ; (৩, ৪ ও ৫)—শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী।

করিয়াছে। অণুবীক্ষণের দৃষ্টিশক্তির বাহিরে যে আরও কত প্রাণী আছে, তাহা কে বলিয়া দিবে? আজ পর্য্যন্ত যে সকল প্রাণীর সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে তাহাদের আকৃতি, আচরণ আলোচনা করিবার জন্য প্রাণিবিদ্যা তাহাদের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছে। প্রাণীদিগকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়ঃ—(১) **এককোষী** ও (২) **বহুকোষী**। এককোষী প্রাণীর দেহে একটি কোষ আছে এবং ঐ একটি কোষ দ্বারা তাহারা জীবনের সমস্ত কার্য্য করিতে পারে। এই শ্রেণীর প্রাণীদের **প্রোটোজোয়া** (protozoa) বা **আদ্যপ্রাণী** বলা হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত ইহাদের সচরাচর দেখা যায় না। অধিকাংশ প্রোটোজোয়া জলে অর্থাৎ পুকুর, নদী, নালা, সমুদ্র ইত্যাদিতে বাস করে। কতকগুলি প্রোটোজোয়া মানুষের দেহে বাস করিয়া নানাপ্রকারের ব্যাধি সৃষ্টি করে। বহুকোষী প্রাণীর দেহে অনেক কোষ থাকে। ইহাদের প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়ঃ—(ক) **অমেরুদণ্ডী** ও (খ) **মেরুদণ্ডী**। যে সকল প্রাণীর মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া নাই তাহাদের অমেরুদণ্ডী বলে; যথা—পিপীলিকা, মৌমাছি, চিংড়ি মাছ, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি। যাহাদের শিরদাঁড়া আছে, তাহাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে; যথা—মাছ, ব্যাঙ, কুমীর, পক্ষী কুকুর, বানর, মানুষ ইত্যাদি। সমগ্র প্রানিজগতে অমেরুদণ্ডীর সংখ্যা মেরুদণ্ডী অপেক্ষা অনেক বেশী। এই দুই প্রধান শাখার অন্তর্গত প্রাণীদের মধ্যে আকৃতি ও স্বভাবগত অনেক প্রকার বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। সেই সকল বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণীদিগকে আবার কয়েকটি শাখাশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

অমেরুদণ্ডীর বিভাগঃ—(১) পরিফেরা বা ছিদ্রাল প্রাণী যথা স্পঞ্জ প্রভৃতি। (২) সিলেন্‌টারা বা একনালী দেহী যথা প্রবাল, হাইড্রা, সাগরকুসুম, জেলিফিশ প্রভৃতি। (৩) প্লাটিহেলমিনথিস্ বা

চ্যাপ্টাকৃমি যথা যকৃৎকৃমি, ফিতাকৃমি ইত্যাদি। (৪) নিমাথেলমিনথিস্ বা গোলকৃমি যথা অন্ত্রের ক্ষুদ্র কৃমি ইত্যাদি। (৫) আনেলিডা বা অঙ্গুরীমাল যথা কেঁচো, জোঁক ইত্যাদি। (৬) একাইনোডার্মাটা বা কণ্টকত্বক্ যথা সমুদ্রশসা, তারামাছ প্রভৃতি। (৭) আর্থ্রোপোডা বা সন্ধিপদ যথা চিংড়ি, কাঁকড়া, বিছা, মশা, মাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি। প্রাণিজগতের এই পর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল। (৮) মলাস্কা বা শম্বুক যথা শামুক, গেঁড়ি, শঙ্খ, কড়ি, ঝিনুক ইত্যাদি।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়ঃ—(১) করোটি-বিহীন ও (২) করোটিবিশিষ্ট। করোটিবিহীন আবার তিনটি শাখা-শ্রেণীতে বিভক্ত। করোটিবিশিষ্ট প্রাণী পাঁচ রকমের হয়। ইহাদের তিন প্রকার প্রাণীকে **শীতল রক্তবিশিষ্ট** প্রাণী বলে, কারণ ইহাদের দেহে শীতল রক্ত প্রবাহিত হয়। মৎস্য (ইহারা জোড়া পাখনার সাহায্যে জলে সাঁতার দিতে পারে ও ফুল্কোর সাহায্যে শ্বাসকার্য্য করে), উভচর (ইহারা শৈশবে ফুল্কো ও পরিণত বয়সে ফুস্ফুস্ সাহায্যে শ্বাস লয়; যথা ব্যাঙ্) ও সরীসৃপ (শৈশব হইতে ফুস্ফুস্ দ্বারা শ্বাস লয়; যথা কুমীর, গিরগিটি, সাপ ইত্যাদি) শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী। অবশিষ্ট দুই শ্রেণীর প্রাণী **উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট** বলিয়া গণ্য হয় অর্থাৎ ইহাদের দেহে নিজস্ব উত্তাপ থাকে এবং সেই উত্তাপ বাহ্যিক তাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। পক্ষী ও স্তন্যপায়ী—গরু, কুকুর, বানর, মানুষ ইত্যাদি—উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণী।

মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডীর তুলনা

মেরুদণ্ডী	অমেরুদণ্ডী
১। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট।	১। মেরুদণ্ডহীন।
২। মস্তিষ্কের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ থাকে।	২। ত্বক্ হইতে চক্ষু উৎপন্ন।
৩। পিঠের দিকে নার্ভতন্ত্র।	৩। পেটের দিকে নার্ভতন্ত্র।
৪। হৃৎপিণ্ড পেটের দিকে অবস্থিত।	৪। হৃৎপিণ্ড থাকিলে পিঠের দিকে থাকে।

নিম্নে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের মোটামুটি একটি ছক দেওয়া হইল :—

অনুশীলন
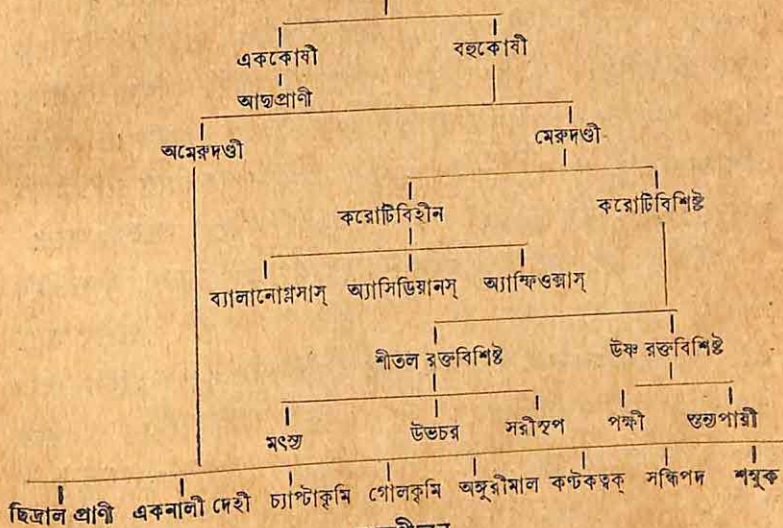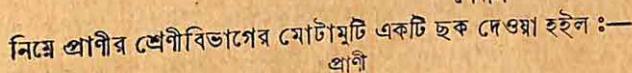
১। জীব ও জড়ের মধ্যে প্রভেদ কি ?

২। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে কোন্ কোন সাদৃশ্য আছে তাহা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ কর।

একাদশ অধ্যায়

মটর গাছের দেহাংশ পর্য্যবেক্ষণ

মটরগাছ সপুষ্পক উদ্ভিদ্। ইহার বীজ আবৃত থাকে এবং ইহা দ্বিবীজপত্রী। একটি মটর চারা পরীক্ষা করিলে সাধারণতঃ দেখা যায়, উহার দেহে মূল ও ইহার শাখাপ্রশাখা, কাণ্ড শাখাবিন্যাস ও পাতা ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রহিয়াছে। ভাবীমূল বা ভ্রূণমূল হইতে নির্গত উদ্ভিদের অংশ যাহা আলোক-বিমুখী ও সাধারণতঃ মাটির নীচে থাকে তাহাকে **মূল** বা **শিকড়** (root) বলে। ভাবীকাণ্ড বা ভ্রূণমুকুল হইতে নির্গত উদ্ভিদের অংশ যাহা আলোকাভিমুখী ও সাধারণতঃ মাটির উপরে থাকে তাহাকে **কাণ্ড** (stem) বলে। মটরগাছের কাণ্ড দুর্ব্বল বলিয়া ইহাকে **লতাগাছ** বলে। কাণ্ড হইতে শাখা ও তাহা হইতে প্রশাখা বাহির হয়, ইহাকে **শাখাবিন্যাস** (branching) বলে। শাখা-প্রশাখায় সবুজ **পাতা** (leaf) থাকে। সময়মত আবার মটরগাছে **ফুল** (flower), **ফল** (fruit) ও **বীজ** (seed) দেখিতে পাওয়া যায়।

মটর গাছের মূল পর্য্যবেক্ষণ :—মটরগাছের মূল সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে উহার কতকগুলি বিশেষ অংশ আছে ; যথা **প্রধান মূল, শাখামূল, মূলরোম ও মূলত্রাণ** (৩৭নং চিত্র দেখ)। প্রধান মূল বৃক্ষের অবলম্বন। শাখামূলগুলি বিভিন্নদিকে বিস্তৃত হইয়া মাটি হইতে রস শোষণে সাহায্য করে। মূলরোমগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমের ন্যায় ; মূল হইতে বাহির হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহাদের সাহায্যেই গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করে। মূলত্রাণ মূলের সর্ব্বশেষ অংশ। উহা ঢাকনীর মত মূলের আগায় থাকে (লেন্স দিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায়) এবং শক্ত মাটি ভেদ

করিবার সময় যাহাতে মূলে কোন আঘাত না লাগে তাহার প্রতিবিধান করে।

৩৭নং চিত্র—মটর গাছের বিভিন্ন অংশ

[মূল সচরাচর দুই প্রকারের হয়—(১) **স্থানিক মূল** (True or Normal root) ও (২) **অস্থানিক মূল** (Adventitious root)। যে সকল মূল ভ্রূণমূল বা ভাবীমূল

(radicle) হইতে জন্মায়, তাহাদিগকে **স্থানিক মূল** বলে। যে সকল মূল ভ্রূণমূল বা ভাবীমূল হইতে না জন্মিয়া উদ্ভিদের অন্য কোন অংশ—যেমন ভ্রূণদণ্ড, কাণ্ড, পাতা ইত্যাদি—হইতে জন্মায়, তাহাদিগকে **অস্থানিক মূল** বলে। অধিকাংশ দ্বিবীজপত্রী বীজ যেমন আম, মটর ইত্যাদি অঙ্কুরিত হইলে ভ্রূণমূল বা ভাবীমূল হইতে যে মূখ্য মূল (Primary root) নির্গত হয়, তাহা নষ্ট না হইয়া ক্রমাগত মাটির নীচে পুষ্টভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং **প্রধান মূলে** (Tap Root) পরিণত হয়। প্রধান মূল বিভিন্ন দিকে শাখা-প্রশাখা চালাইয়া দিয়া মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং গাছকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখে। ইহাই **প্রধান মূলতন্ত্র** নামে পরিচিত (Tap Root System)। সাধারণতঃ একবীজপত্রী বীজ যেমন ধান, গম ইত্যাদি অঙ্কুরিত হইলে ভ্রূণমূল বা ভাবীমূল হইতে যে মূখ্য মূল নির্গত হয় তাহা বেশী দূর অবধি বর্দ্ধিত না হইয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং বীজদণ্ডের গোড়া হইতে একগোছা সরু মূল বাহির হইয়া নীচে মাটির ভিতর কিছুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। এইরূপ মূলকে **গুচ্ছমূল** (Fibrous root) বলে এবং ইহাই **গুচ্ছ মূলতন্ত্র** (Fibrous Root System) নামে পরিচিত। সুতরাং আমাদের বলিতে হয় যে, প্রধান মূলতন্ত্র স্থানিক মূলের অন্তর্গত এবং গুচ্ছ মূলতন্ত্র অস্থানিক মূলের অন্তর্গত (৪০নং চিত্রে বিভিন্ন প্রকারের অস্থানিক মূল দেখ)।]

৩৮নং চিত্র—প্রধান মূলতন্ত্র

৩৯নং চিত্র—গুচ্ছ মূলতন্ত্র

মটর মূলের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার মূলে একপ্রকার গুটি থাকে। এইগুলির ভিতর ছোট ছোট দাঁড়ির আকারের জীবাণু (অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্ট) থাকে। এই জীবাণু মটর লতার পরম উপকারক। এই জীবাণু মাটির মধ্যস্থ বায়ু হইতে প্রত্যক্ষভাবে সোরাজান লইয়া (সাধারণতঃ উদ্ভিদেরা বায়ু হইতে প্রত্যক্ষভাবে সোরাজান ব্যবহার করিতে পারে না) তাহা মটর লতার খাদ্যোপ-

যোগী করিয়া দেয় ও নিজেরা মটর লতা হইতে শর্করা জাতীয় দ্রব্য
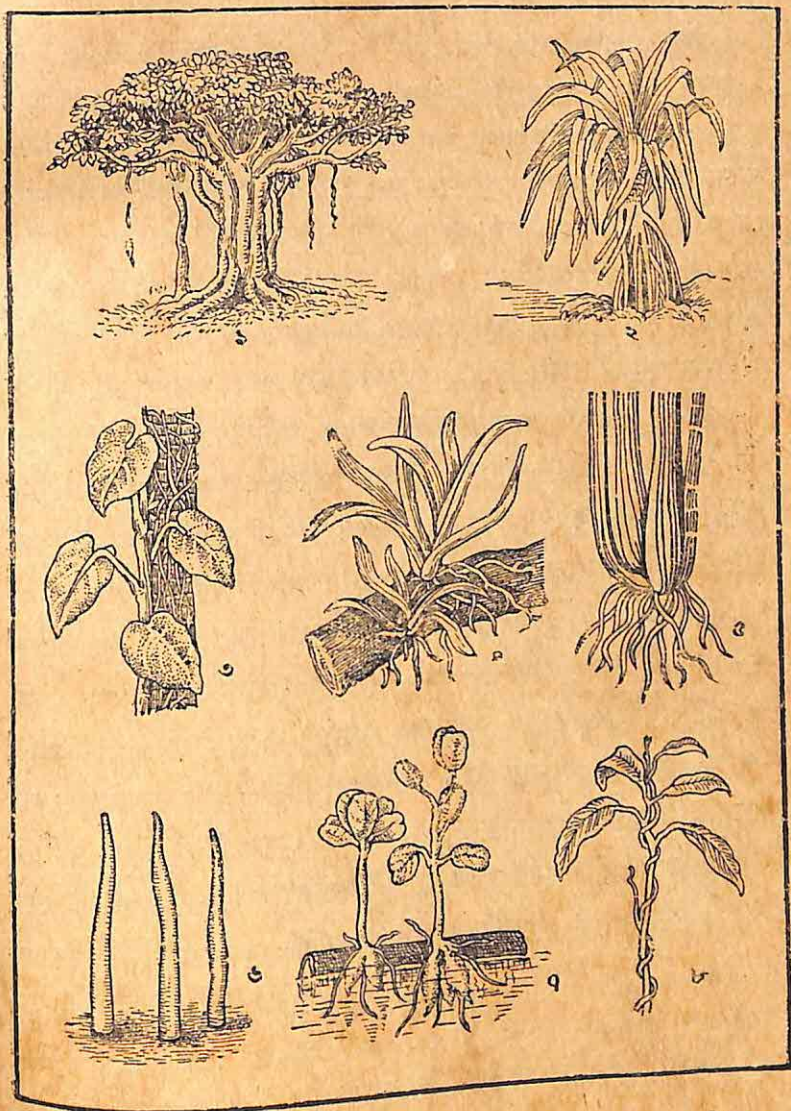
৪০নং চিত্র—(১) স্তম্ভমূল, (২) ঠেশ মূল, (৩) আরোহী মূল, (৪) বায়বীয় মূল, (৫) গুচ্ছমূল, (৬) নাসিকামূল, (৭) ভাসমানমূল, (৮) শোষক মূল।

গ্রহণ করে। এই প্রকার জীবাণুকে সোরাজান-খাদ্য-পরিণতকারক জীবাণু বলে।

মটর গাছের কাণ্ড পর্য্যবেক্ষণ :—পূর্ব্বেই বলিয়াছি মটর লতা গাছ। মটর গাছের কাণ্ড সবুজ, সরু, ফাঁপা ও **দুর্ব্বল**। কাণ্ডের

[কাণ্ডকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) **খাড়া কাণ্ড** ; যথা—আম, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছের কাণ্ড (২) **দুর্ব্বল কাণ্ড** ; যথা—মটর, কুমড়া, ইত্যাদি গাছের কাণ্ড।]

যে অংশ হইতে পাতা বাহির হয় তাহাকে **গাঁইট** বা **পর্ব্ব** বলে। কাণ্ডের দুই গাঁইটের বা পর্ব্বের মধ্যবর্ত্তী অংশকে **পর্ব্বমধ্য** বলে। লক্ষ্য করিয়া দেখ, মটর গাছের কাণ্ডের গাঁইট বা পর্ব্ব হইতে পর্য্যায়ক্রমে বিপরীত দিকে পাতা বাহির হয় (৩৭নং চিত্র দেখ)।

মটর গাছের পাতা পর্য্যবেক্ষণ :—সাধারণতঃ পাতার যে তিনটি অংশ থাকে—**গোড়া**, **বৃন্ত** বা **বোঁটা** ও **ফলক**—তাহা মটর পাতাতেও আছে। মটর বৃন্তের উভয় পার্শ্বে দুইটি বড় উপপত্র থাকে। মটর গাছের পাতাগুলি যৌগিক (বৃন্তে একটি ফলক থাকিলে মৌলিক ও একাধিক ফলক থাকিলে যৌগিক পত্র বলা হয়)। পাতার কয়েক জোড়া অনুফলক (যৌগিক পত্রের এক একটি ছোট ফলককে অনুফলক বলে) থাকে কিন্তু আগার অনুফলকগুলি আকর্ষে পরিবর্ত্তিত হয় (৩৭নং চিত্র দেখ)। এই আকর্ষের সাহায্যে ইহারা অন্য গাছ বা কাঠি বা বেড়ার উপর উঠিয়া যায়। ইহার পাতার শিরাবিন্যাসকে **জাল-শিরাবিন্যাস** বলে ; কারণ ইহার শিরা উপশিরাগুলি মিলিয়া একটি জটিল জালের সৃষ্টি করে।

[মোটামুটিভাবে শিরাবিন্যাসকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—জাল-শিরাবিন্যাস ও সমান্তরাল-শিরাবিন্যাস। সমান্তরাল-শিরাবিন্যাসে শিরাবলী পত্রফলকের গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত পাশাপাশি সরলভাবে বিন্যস্ত থাকে যেমন বাঁশ, তাল, কলাপাতা ইত্যাদির শিরাবিন্যাস।]

মটর গাছের ফুল পর্য্যবেক্ষণ :—সাধারণতঃ ফুলের যে চারিটি অংশ থাকে—**বৃতি**, **দল**, **পুংকেশর চক্র** ও **গর্ভকেশর চক্র**—তাহা মটর

ফুলেও আছে। সুতরাং মটর ফুল উভলিঙ্গ ও সম্পূর্ণ। ইহার গোড়ায় সবুজ রঙের পাঁচটি বৃত্যাংশ সহ বৃতি আছে। দল সাধারণতঃ বেগুনি বা নীল বর্ণের হয়; সময় সময় সাদাও হয়। দলে পাঁচটি অসমান পাপড়ি থাকে। সবচেয়ে বড় পাপড়িকে **পতাকা** ও দুই পাশের দুইটি ডানার মত পাপড়িকে **পক্ষ** বলে। পক্ষের ভিতরকার দুইটি পাপড়ি জুড়িয়া গিয়া নৌকার মত হইয়াছে; তাই উহাদিগকে **নৌকা** বলে। দলের ভিতর ইহার পুংকেশর চক্র ও গর্ভকেশর চক্র অবস্থিত। পুংকেশর চক্রে দশটি পুংকেশর আছে। ইহার মধ্যে নয়টি গোড়ার দিকে একসঙ্গে জোড়া ও অপরটি পৃথক (৩৭নং চিত্র দেখ)। পুংকেশরের দুইটি অংশ— সূতার মত সূক্ষ্ম নিম্নাংশকে **সূত্র** বা **কেশরদণ্ড** এবং সূতার মাথায় মুণ্ডির ন্যায় অংশটিকে **পরাগকোষ** বলে। পরাগকোষের মধ্যে আছে **পরাগস্থলী** এবং উহার মধ্যে অসংখ্য **পরাগরেণু** এবং এই পরাগরেণু হইতে জন্মায় **পুংজননকোষ**। মটর ফুলের গর্ভকেশর চক্রে একটি মাত্র গর্ভকেশর থাকে। সাধারণতঃ গর্ভকেশরের যে তিনটি অংশ থাকে—**গর্ভমুণ্ড, গর্ভদণ্ড** ও **গর্ভকোষ**—তাহা মটর ফুলের গর্ভ-কেশরেও দেখা যায়। গর্ভকোষটি লম্বা, গর্ভদণ্ড ছোট ও ছোট গর্ভদণ্ডটি ক্রমশঃ সরু হইয়া গর্ভমুণ্ডে শেষ হইয়াছে (৩৭নং চিত্র দেখ)। গর্ভমুণ্ড আঠাল। গর্ভকোষের একধারে কয়েকটি ডিম্বকোষ সারিবদ্ধভাবে সাজান থাকে। প্রত্যেক ডিম্বকোষে আছে **ভ্রূণস্থলী** (embryo-sac) এবং এই ভ্রূণস্থলী হইতে জন্মায় **স্ত্রীজননকোষ**।

মটর গাছের ফল পর্য্যবেক্ষণ :—মটরের ফলকে মটরশুঁটি বলে। ফলের সাধারণতঃ যে দুইটি অংশ থাকে—**ফলত্বক্** ও **বীজ**—তাহা মটরশুঁটিতেও আছে। ফলত্বকের সাধারণতঃ আবার যে তিনটি অংশ থাকে—**বাহিরের খোসা, ভিতরের শাঁস** ও **সর্ব্বনিম্নস্থ আঁঠির আবরণ** (আম ফল লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ)—তাহা অনেক

ফলের ন্যায় মটরশুঁটিতেও সুস্পষ্ট নহে। মটরশুঁটির ভিতর একসারি বীজ একাধারে সাজান থাকে। খোসা ও বীজের মধ্যে একখানা পাতলা পর্দ্দা আছে। এই ফলে শাঁস নাই। বীজগুলি পুষ্ট হইলে মটরশুঁটি ফাটিয়া যায় এবং বীজগুলি ছড়াইয়া পড়ে। মটরশুঁটিকে মৌলিক, নীরস ও স্ফোটক ফল বলে।

[একটি ফুল হইতে একটি ফল হয় বলিয়া মটরশুঁটি মৌলিক ফল। একটি ফুল হইতে যদি একাধিক ফল হয় তবে তাহাকে **গুচ্ছ ফল** বলে—যেমন আতা। একাধিক ফুল হইতে যদি একটি ফল জন্মায় তবে তাহাকে **যৌগিক ফল** বলে—যেমন কাঁঠাল।]

মটর গাছের বীজ পর্য্যবেক্ষণ :—শুক্‌না অবস্থায় বীজ শক্ত থাকে বলিয়া পরীক্ষা করার অসুবিধা হয়। কয়েকটি মটর বীজকে এক-রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখ। পরদিন সকালে একটি বীজ লইয়া তাহার গা হইতে সমস্ত জল শুক্‌না কাপড় দিয়া মুছিয়া পরীক্ষা কর। দেখিবে, বীজটি একটি পাতলা **খোসা** দিয়া আবৃত। এই খোসার উপর একটি দাগ আছে, উহাকে **প্রবীজনাভি** বলে। প্রবীজনাভির নিকটে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, উহাকে **ডিম্বকরন্ধ্র** বলে (৩৭নং চিত্র দেখ)। ভিজা বীজে চাপ দিলে এই রন্ধ্র দিয়া জল বাহির হইয়া আসে। খোসা ছাড়াইলে বীজের যে অংশটি পাওয়া যায় তাহাকে **ভ্রূণ** বা **শিশুউদ্ভিদ্‌** বলে। এই ভ্রূণ হইল ভাবী চারা গাছ। ভ্রূণে অল্প চাপ দিলে ইহা তুইটি মোটা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহাদের **বীজপত্র** বলে। বীজপত্র তুইটি একটি ছোট সরু দণ্ডের সঙ্গে লাগান থাকে। এই দণ্ডটিকে **বীজদণ্ড** বা

[যে সকল বীজের খোসা ছাড়াইলে তুইটি পৃথক পৃথক মোটা দানা পাওয়া যায় তাহাদিগকে **দ্বিবীজপত্রী** বা **দ্বিদল বীজ** বলে; ছোলা, মটর, রেড়ি, আম ইত্যাদি এই শ্রেণীর বীজ। যে সকল বীজের খোসা ছাড়াইলে একটিমাত্র দানা পাওয়া যায় তাহাদিগকে **একবীজপত্রী** বা **একদল বীজ** বলে; ধান, গম ভুট্টা, ইত্যাদি এই শ্রেণীর বীজ।]

ভ্রূণদণ্ড বলে। লেন্‌সের সাহায্যে দেখ, উহার এক প্রান্তের সরু অগ্রভাগ ঐ তুই খণ্ডের ভিতর রহিয়াছে ও অপর প্রান্তের

কিঞ্চিৎ মোটা অগ্রভাগ ঐ দুই খণ্ডের বাহিরে রহিয়াছে। বীজদণ্ড বা ভ্রূণদণ্ডের বাহিরের দিকের অগ্রভাগকে **ভ্রূণমূল** বা **ভাবীমূল** বলে এবং ভিতরের অগ্রভাগকে **ভ্রূণমুকুল** বা **ভাবীকাণ্ড** বলে (৩৭নং চিত্র দেখ)। ভাবীমূল বড় হইয়া মাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া শিকড়ে পরিণত হয়। ভাবীকাণ্ড মাটির উপর বাড়িয়া কাণ্ড, ডালপালা ও পাতার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

মটরের বীজপত্রদ্বয় বেশ মোটা ও পুরু। ভবিষ্যৎ শিশুউদ্ভিদের খাদ্য ইহার বীজপত্রীতেই সঞ্চিত থাকে। তোমরা জেনে রাখ, যে সকল বীজের বীজপত্রীতে ভবিষ্যৎ শিশুউদ্ভিদের জন্য খাদ্য সঞ্চিত থাকে তাহাদের **অন্তঃসার** বীজ বলে। মটর অন্তঃসার বীজ। অধিকাংশ দ্বিবীজপত্রী বীজ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যে সকল বীজে ভবিষ্যৎ শিশুউদ্ভিদের জন্য খাদ্য বীজপত্রীতে সঞ্চিত না থাকিয়া বীজপত্রের বাহিরে অন্য অংশে সঞ্চিত থাকে তাহাদের **বহিঃসার** বীজ বলে। অধিকাংশ একবীজপত্রী বীজ ও কতকগুলি দ্বিবীজপত্রী বীজ (যেমন রেড়ি, পেঁপে ইত্যাদি) এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এইবার মটর বীজের অঙ্কুরোদ্গম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। বীজের খোসা ভেদ করিয়া ভ্রূণের বাহিরে আসাকে অঙ্কুরোদ্গম বলে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য পরিমিত জল, বায়ু ও তাপের প্রয়োজন। আল্‌গা মাটিতে (যাহাতে বায়ু চলাচলের সুবিধা হয়) কয়েকটি ভিজা মটর বীজ পুঁতিয়া রাখিয়া তাহাতে পরিমিত জল দাও। বীজগুলি জল শুষিয়া ফুলিয়া উঠে এবং প্রত্যেক বীজে ভ্রূণমূল ডিম্বকরন্ধ্রের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসে। ডিম্বকরন্ধ্রটি উপরের দিকে থাকিলেও ভ্রূণমূলটি উহার ভিতর দিয়া বহির্গত হইয়া বাঁকিয়া নীচের দিকে যায়। উহা ক্রমশঃ মাটির নীচে প্রবেশ করিয়া একটি প্রধান মূল ও শাখাপ্রশাখার সৃষ্টি করে। ভ্রূণমূলের বৃদ্ধির সাথে সাথে ভ্রূণমুকু

বীজের খোসা ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে এবং মাটির উপরের দিকে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উহা হইতে ক্রমশঃ কাণ্ড ও সবুজ পাতার সৃষ্টি হয়। বীজপত্র দুইটি বীজের খোসার মধ্যে থাকিয়া যায় ও সঞ্চিত খাদ্য শেষ হইলে (জীবনের প্রারম্ভে বীজপত্রে সঞ্চিত খাদ্য খাইয়াই ভ্রূণ ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে) উহারা শুকাইয়া যায়। এইভাবে মটর বীজ হইতে নূতন চারাগাছের জন্ম হয়।

মটরগাছের বিভিন্ন দেহাংশ পর্য্যবেক্ষণ করা হইল। এইবার উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কি কি কার্য্য সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

মূলের কার্য্য :—মূল দ্বারা উদ্ভিদের কি কি কার্য্য হইয়া থাকে? ইহা দুইটি প্রধান কাজ করে—(১) **মূল গাছকে মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখে।** মূলত্রাণের সাহায্যে মূল মাটি ভেদ করিয়া অগ্রসর হয় এবং শাখাপ্রশাখাদের সাহায্যে মাটিতে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া থাকে। **(২) মূল মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে রস শোষণ করে।** বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে গাছের পুষ্টিসাধনের জন্য প্রধানতঃ দশটি মৌলিক পদার্থ আবশ্যক হয়—**অঙ্গার, উদজান, অম্লজান, সোরাজান, ক্যাল্‌সিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, পোটাসিয়াম, ফস্‌ফরাস্‌, লৌহ ও গন্ধক।** ইহার মধ্যে প্রথমটি গাছ পাতা ও সূর্য্যালোকের সাহায্যে বাতাস হইতে সংগ্রহ করে। বাকি নয়টি মৌলিক পদার্থ গাছ মূল ও মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে শোষণ করে।

[উপরোক্ত কার্য্য ব্যতীত অবস্থাবিশেষে মূল অন্যান্য কার্য্য করে ; যথা (১) গাছের ভার বহনে সাহায্য করা—যেমন বট ও কেয়াগাছের মূল। (২) দুর্ব্বল দেহ গাছকে আরোহণে সাহায্য করা—যেমন গজপিপুল ও পানের আরোহী মূল। (৩) জলজ গাছকে জলে ভাসিতে সাহায্য করা—যেমন কেশরদামের ভাসমান মূল। (৪) অন্য গাছ হইতে শোষক মূলের সাহায্যে রস ও খাদ্য সংগ্রহ করা—যেমন স্বর্ণলতা, বেলে বউ প্রভৃতির মূল। (৫) খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া জমাইয়া রাখা—যেমন মূলা. গাজর, শতমূলি প্রভৃতির মূল।]

কাণ্ডের কার্য্য :—কাণ্ড দ্বারা উদ্ভিদের কি কি কার্য্য হইয়া থাকে? ইহা দুইটি প্রধান কাজ করে—(১) আমাদের হাড় যেমন দেহখানাকে খাড়া করিয়া রাখে, কাণ্ড সমস্ত গাছটাকে মাটির উপর তেমনি খাড়া করিয়া রাখে। ইহার অংশ অর্থাৎ শাখাগুলি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পাতাগুলিকে রৌদ্র ও বাতাসের মধ্যে মেলিয়া রাখে। রৌদ্র ও বাতাস গাছের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। (২) গাছের দেহের মধ্যে মাটি হইতে সংগৃহীত রস ও পাতায় তৈয়ারী খাদ্যদ্রব্যের চলাচলের সুব্যবস্থা করা কাণ্ডের আর একটি প্রধান কাজ। কাণ্ডের মধ্যে অনেকগুলি শাখাপ্রশাখাযুক্ত সূক্ষ্ম নালিকা থাকে। তাহাদের কতকগুলির মধ্য দিয়া মূলদ্বারা মাটি হইতে গৃহীত জল ও আকরিক খাদ্য পাতার মধ্যে সঞ্চালিত হয়। এই নালিকাগুলিকে বলে **জাইলেম**। রৌদ্র ও বাতাসের সাহায্যে পাতার মধ্যে সে সকল খাদ্য প্রস্তুত হয় তাহা আবার কাণ্ডের অপর কতকগুলি নালিকা দিয়া গাছের দেহের নানা স্থানে সঞ্চালিত ও সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই নালিকাগুলির নাম **ফ্লোয়েম**।
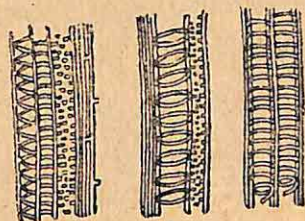
৪১নং চিত্র—কাণ্ডের নালিকা

উপরোক্ত কার্য্য ছাড়াও অবস্থাবিশেষে কাণ্ড অন্যান্য কার্য্য করে ;—(১) বংশবৃদ্ধির সাহায্য—এমন অনেক উদ্ভিদ্ আছে যাহাদের ফুল ও বীজ থাকা সত্ত্বেও বংশবৃদ্ধি সাধারণতঃ কাণ্ড হইতে হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড আলু, (কাণ্ড সাধারণত মাটির উপরে থাকে কিন্তু কয়েকপ্রকার গাছের কাণ্ড মাটির নীচে থাকে এবং তাহাদের ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড বলে।) পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি। তাহা ছাড়াও সাধারণ গাছের কাণ্ড হইতে কলম বাঁধিয়া গাছের বংশবৃদ্ধি হয় ; যেমন আম ইত্যাদি। (২) খাদ্যসঞ্চয়—সকল প্রকার ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি। এইজন্য আমরা এই সকল কাণ্ড খাই। (৩) পাতার কাজ—কখনও কখনও পাতার কার্য্য করিবার জন্য কাণ্ড সবুজবর্ণের হয় ; যেমন ফণিমনসা ইত্যাদি। (৪) আত্মরক্ষা—অনেক গাছের শাখা কাঁটায় রূপান্তরিত হইয়া গাছকে আত্মরক্ষা করিবার সাহায্য করে ; যেমন ময়না, বৈঁচি ইত্যাদি। (৫) আরোহণে সাহায্য—লতাগাছের শাখা আকর্ষে রূপান্তরিত হইয়া উহাকে উপরে উঠিবার সাহায্য করে ; যেমন মটর, কুমড়া ইত্যাদি।

পাতার কার্য্য—বৃক্ষের বাঁচিয়া থাকা ও পুষ্টির জন্য পাতা একান্ত প্রয়োজনীয়। উহার কার্য্য প্রধানতঃ—(ক) **অঙ্গার আত্মকরণ**, (খ) **শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া** ও (গ) **প্রস্বেদন**। এই কার্য্যগুলি পাতা কি ভাবে সম্পাদন করে তাহা দেখা যাক।

পাতার নীচের দিকের ছালে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। ইহাদের **রন্ধ্র** বা **ষ্টোমা** বলে। নগ্নচক্ষে ইহাদের দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। অন্ধকারে ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া যায়। দিনের বেলায় সূর্য্যের আলোক স্পর্শে ছিদ্রগুলি খুলিয়া যায়। প্রত্যেক রন্ধ্রের দুই পাশে একটি করিয়া **প্রহরী কোষ** থাকে। ইহারা রন্ধ্রের ছিদ্রকে বড় এবং ছোট হইতে সাহায্য করে। প্রহরী কোষের ভিতর ক্লোরোফিলকণা ও নিউক্লিয়স্ আছে।
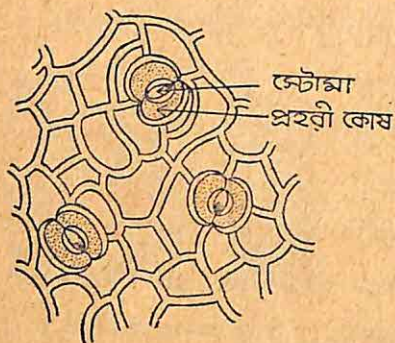
৪২নং চিত্র—পাতার ছিদ্র

(ক) **অঙ্গার আত্মকরণ**—অঙ্গার বৃক্ষের দেহগঠনের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। গাছ বাতাস হইতে পাতার সাহায্যে অঙ্গার গ্রহণ করে। পাতার ক্লোরোফিলকণা তাহার এই কার্য্যের প্রধান সহায়। বায়ুর সহিত অঙ্গারাম্ল গ্যাস রন্ধ্রের ভিতর দিয়া পাতায় প্রবেশ করে। এদিকে আবার মূলরোম দিয়া মাটি হইতে শোষিত রস মূল, কাণ্ড ও পাতার শিরা উপশিরার ভিতর দিয়া পাতায় যায়। তখন পাতার **ক্লোরোফিলকণা** ও **সূর্য্যকিরণের** সাহায্যে **জল** ও **অঙ্গারাম্ল গ্যাসের** বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া হয় এবং ফলে গাছের খাদ্য (শর্করা) প্রস্তুত হয় ও অম্লজান মুক্ত হইয়া বাতাসে মিশে। অঙ্গারাম্লকে উক্ত

প্রকারের পরিবর্ত্তন করার নাম **অঙ্গার আত্মকরণ**। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অঙ্গার আত্মকরণে গাছের ওজন বাড়ে ও শক্তি সঞ্চয় হয় এবং এই ক্রিয়া আলোক ভিন্ন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য **সূর্য্যের আলোক গাছের প্রাণস্বরূপ**।

গাছ যে অঙ্গার আত্মকরণ করে এবং অম্লজান গ্যাস ছাড়িয়া দেয় তাহা নিম্নের পরীক্ষা হইতে বুঝা যায়ঃ—

অঙ্গার আত্মকরণের পরীক্ষা—একটি কাচের পাত্রের মধ্যে খানিকটা জল ও কতকগুলি ঝাঁঝি রাখিয়া ঝাঁঝিগুলিতে একটি ফানেল উপুড় করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। ফানেলের সরু মুখটি এখন জলের মধ্যেই ডুবিয়া আছে। এবার একটি জলপূর্ণ পরীক্ষ-নল ফানেলের সরু মুখের উপর উপুড় করিয়া বসাইয়া পাত্রটিকে দুই তিন ঘণ্টা রৌদ্রে বসাইয়া দিলে দেখিবে যে, জলের মধ্য হইতে ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে এবং পরীক্ষ-নলের জলও খানিকটা বাহির হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, ফানেলমধ্যস্থ ঝাঁঝিগুলির ক্লোরোফিলকণা সূর্য্যালোক পাইয়া অঙ্গার গ্রহণ ও অম্লজান ত্যাগ করিতেছে। পরীক্ষ-নলের গ্যাসকে একটি শিখাহীন জ্বলন্ত কাঠি দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহা অম্লজান। পাত্রটিকে রৌদ্র হইতে সরাইয়া রাখিলে আর বুদ্‌বুদ্ উঠিবে না; সূর্য্যালোক ভিন্ন গাছের অঙ্গার আত্মকরণ সম্ভব নহে।
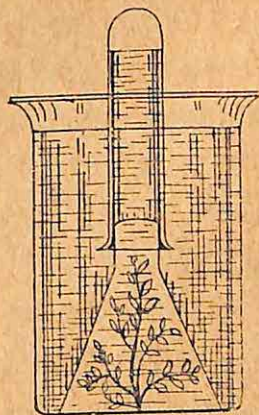
৪৩নং চিত্র—গাছের খাদ্য প্রস্তুত-করণে অম্লজানত্যাগ পরীক্ষা

(খ) **শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া**—প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদ্‌ও দিবারাত্র শ্বাসকার্য্য করিয়া থাকে। পাতার রন্ধ্রপথেই সাধারণতঃ গাছের শ্বাসকার্য্য চলে। রাত্রিকালে যখন ষ্টোমা বন্ধ হইয়া যায় তখন লেন্টিসেল (lenticel) পথেই এই ক্রিয়া চলে। শ্বাসকার্য্যের ফলে বৃক্ষের দেহতন্তুগুলির বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় ও তাপ বজায় থাকে। এই কার্য্যের জন্য আলোক বা ক্লোরোফিলকণার প্রয়োজন হয় না। প্রশ্বাসের সময় উদ্ভিদ্ প্রধানতঃ পাতার রন্ধ্র দিয়া দেহের মধ্যে বাতাস টানিয়া লয়। কোষের সঞ্চিত

খাদ্যের সহিত বাতাসের অম্লজান গ্যাসের মৃদু দহন কার্য্যের ফলে উদ্ভিদ্‌দেহে তাপের উদ্ভব হয় এবং অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হয়। কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে **নিশ্বাস হিসাবে** বাহির হইয়া যাইতে পারে না। কারণ দিনের বেলায় আলোর সাহায্যে উদ্ভূত অঙ্গারাম্ল গ্যাস উদ্ভিদের দেহের মধ্যে বিশ্লেষিত হয় এবং তজ্জন্য অম্লজান পৃথক্ হইয়া পড়ে। সেই অম্লজান রন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া বায়ুতে আসিয়া মিশে। অর্থাৎ দিনের বেলায় অঙ্গার আত্মকরণ ক্রিয়ায় আধিক্য হেতু উদ্ভিদের শ্বাসকার্য্য যেন ঢাকা পড়িয়া যায়; কিন্তু উহা বন্ধ হয় না। রাত্রিকালে আলোর অভাবে অঙ্গার আত্মকরণ কার্য্য বন্ধ থাকে, কাজেই শ্বাসকার্য্যের (শ্বাস-কার্য্য দিনে ও রাত্রে সমভাবে চলে) দরুণ উদ্ভূত অঙ্গারাম্ল গ্যাস (যাহা দিনের বেলায় বিশ্লেষিত হয়) ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশে। শ্বাসকার্য্যে গাছের ওজন কমিয়া যায়। শ্বাসকার্য্যের সময় গাছ যে অঙ্গারাম্ল গ্যাস পরিত্যাগ করে তাহা নিম্নের পরীক্ষা হইতে বুঝা যায়ঃ—

শ্বাসগ্রহণের পরীক্ষা–একটি বড় বোতলের তলদেশে কিছু পরিষ্কার চূণের জল লও। বোতলের ছিপিটির তলদেশে একটি পিন গুঁজিয়া উহাতে সূতার সাহায্যে কয়েকটি তাজা সবুজ পাতা ঝুলাইয়া বোতলের মধ্যে এমনভাবে রাখ যেন পাতাগুলি চূণের জল স্পর্শ না করে। এখন বোতলটিকে সূর্য্যালোকে রাখ। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখিবে, চূণের জলের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। বোতলটিকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দাও বা অন্ধকার স্থানে রাখিয়া দাও। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখিবে চূণের জল ঘোলাটে হইয়াছে। সূর্য্যালোকে চূণের জলের পরিবর্ত্তন হয় নাই, কারণ তখন সবুজ পাতাগুলির শ্বাসকার্য্য ও অঙ্গার আত্মকরণ দুইই চলিতেছিল এবং শ্বাসকার্য্যের দরুণ উদ্ভূত অঙ্গারাম্ল গ্যাস বিশ্লিষ্ট হইয়া অম্লজান পরিত্যাগ করিতেছিল। অন্ধকারে শুধু শ্বাসকার্য্য চলিতেছিল এবং ফলে পাতাগুলির নিশ্বাসের সহিত অঙ্গারাম্ল ত্যাগ এবং ইহার রাসায়নিক ক্রিয়ায় চূণের জল ঘোলাটে হইল।

(গ) **প্রস্বেদন**—তোমরা জান যে গাছ মূলরোম দিয়া মাটি হইতে খনিজ পদার্থ গোলা পাতলা রস গ্রহণ করে। উপযুক্ত পরিমাণ খনিজ পদার্থ পাইবার জন্য গাছকে অনেক রস শোষণ

করিতে হয়। কিন্তু এত জল গাছের দরকার হয় না। গাছ প্রয়োজনমত সমস্ত জল রাখিয়া বাকী অংশ পাতার রন্ধ্র দিয়া বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দেয়। **যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে অব্যবহৃত বা অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে পত্র হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহাকে প্রস্বেদন বলে।** অত্যধিক উত্তাপ, শুষ্ক বায়ু এবং আলোক প্রস্বেদন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। উষ্ণপ্রধান দেশে বাতাস উষ্ণ হইলে অধিক পরিমাণে জল বাষ্পাকারে নির্গত হয় এবং এইরূপে উদ্ভিদ্ অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত পরীক্ষা হইতে প্রস্বেদন ক্রিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে ঃ—

প্রস্বেদনের পরীক্ষা—অনেকক্ষণ সূর্য্যালোকে ছিল এরূপ একটি টবের গাছ লইয়া উহার গোড়ার মাটি একখণ্ড রবারের চাদর দিয়া সম্পূর্ণরূপে মুড়িয়া দেওয়া হইল। এখন একটি কাচের বেলজার দিয়া গাছটিকে ঢাকিয়া দিলে কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে যে, কাচ পাত্রের ভিতর দিকে জলবিন্দু জমা হইয়াছে। এই জলবিন্দু প্রস্বেদন ক্রিয়ার ফলে বৃক্ষদেহ হইতে নির্গত হয়।

৪৪নং চিত্র—গাছের প্রস্বেদন পরীক্ষা

পূর্ব্বোক্ত কার্য্য ব্যতীত পাতা অবস্থাবিশেষে রূপান্তরিত হইয়া অন্যান্য কার্য্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বড় হোয়ে তোমরা বিস্তারিত পড়বে।
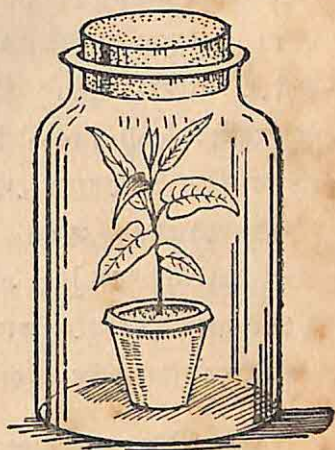
ফুলের কার্য্য ঃ—আবৃত বীজ উদ্ভিদে ফুল হইতে ফল হয় এবং ফলের ভিতর বীজ থাকে এবং সেই বীজ হইতে আবার নূতন উদ্ভিদ্ জন্মায়; নগ্নবীজ উদ্ভিদে ফুল হইতে বীজ হয় এবং সেই বীজ হইতে আবার নূতন উদ্ভিদ্ জন্মায়। সুতরাং **বীজের সৃষ্টিই হইল ফুলের প্রধান কার্য্য।** পরাগরেণু হইতে পুংজননকোষ ও

ভ্রূণস্থলী হইতে স্ত্রীজননকোষের উদ্ভব হয়। পরাগরেণু ভ্রূণস্থলীর খুব কাছাকাছি না আসিলে পুংজননকোষের সহিত স্ত্রীজননকোষের মিলন সম্ভব নয়। কিন্তু পরাগরেণু বা ভ্রূণস্থলীর এমন কোন গমনাগমনশক্তি নাই যাহাদ্বারা তাহারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হয়। প্রকৃতিদেবী সুন্দর ব্যবস্থার দ্বারা ইহা সম্ভব করিয়া তোলেন। **যে প্রক্রিয়া দ্বারা পরাগরেণু পরাগকোষ হইতে গর্ভমুণ্ডে আনীত হয়, তাহাকে পরাগযোগ (pollination) বলে।** ফুলের শ্রী ও গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কীটপতঙ্গ ফুলের উপর গিয়া বসে; তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরাগরেণু লাগিয়া যায়। পরে মধু পানের সময় ঐ অঙ্গে মাখা পরাগরেণু সে অজ্ঞাতে গর্ভকেশরের মুণ্ডে লাগাইয়া দেয়। গর্ভমুণ্ডে একপ্রকারের রস মাখান থাকে বলিয়া পরাগরেণু উহাতে লাগিয়া যায়। তারপর পরাগরেণু হইতে ছোট ছোট **পরাগনলিকা** (pollen tube) উৎপন্ন হয়। পরাগনলিকা গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়া গর্ভকোষে পৌঁছায় এবং ক্রমে মিলন সাধিত হয় [**পুংজননকোষের সহিত স্ত্রীজননকোষের মিলনকে গর্ভাধান** (fertlisation) **বলে**]। এই পরাগযোগ একই প্রকার গাছের ফুলেই সম্ভব, ভিন্ন ফুলে কার্য্যকরী হইবে না। সাধারণতঃ চারি রকমভাবে পরাগযোগ হইয়া থাকে ঃ—

(১) **কীটপতঙ্গের দ্বারা**—ফুলের শ্রী ও গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গ ফুলের উপর গিয়া বসে; তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরাগরেণু লাগিয়া যায়। পরে মধু পানের সময় ঐ অঙ্গেমাখা পরাগরেণু সে অজ্ঞাতে গর্ভকেশরের মুণ্ডে লাগাইয়া দেয়। গোলাপ, সরিষা, মটর, বেগুন প্রভৃতি ফুলে পরাগযোগ এইরূপে হইয়া থাকে।

(২) **বায়ুর দ্বারা**—ঘাস, পিটুলি, নারিকেল প্রভৃতি কতকগুলি গন্ধহীন ফুলের পরাগরেণু বায়ুর সাহায্যে উড়িয়া গিয়া এক ফুল

হইতে অন্য ফুলে পড়ে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর ফুলের গর্ভদণ্ড উড়ন্ত পরাগরেণু ধরিবার জন্য খুব লম্বা হয়।

(৩) **জল দ্বারা**—শেওলা, ঝাঁঝি প্রভৃতি জলজ গাছের পরাগরেণু জলের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া পরাগযোগ ঘটাইয়া থাকে। পুকুরের জলের ভিতর পাটা শেওলা জন্মে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। ইহাদের একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল পৃথকভাবে ফোটে। কিন্তু ইহাদের মিলনের নিয়ম বেশ চমৎকার। পুরুষ-ফুলটি জলের ভিতরে গাছের গোড়ায় ফোটে। ইহার বৃন্ত খুব ছোট। স্ত্রী-ফুলের বৃন্ত লম্বা। বড় বৃন্তটি ঘড়ির স্প্রিঙের মত জড়াইয়া ফুলটিকে জলের নীচে রাখে। পুরুষ-ফুলটি ফুটিলে বৃন্ত হইতে খসিয়া যায় এবং জলের উপর ভাসিতে থাকে। ঠিক সময় স্ত্রী-ফুলটি তাহার লম্বা বৃন্ত সোজা করিয়া পুরুষ-ফুলের কাছে গিয়া উঠে এবং ফুলে ফুলে মিলন হয়। তারপর স্ত্রী-ফুলটি আবার জলের তলায় ডুবিয়া যায়।

(৪) **পতঙ্গ ব্যতীত অন্য প্রাণীর দ্বারা**—অনেক সময় গরু, ছাগলের মুখে অথবা কাক, শালিক প্রভৃতি পাখীর দ্বারা এক ফুলের পরাগরেণু সেই ফুলের বা অন্য ফুলের গর্ভদণ্ডের মুণ্ডে নীত হয়।

অনুশীলন

১। মটর গাছের বিভিন্ন অংশের সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

২। মূল প্রধানতঃ কয় প্রকারের হয় ? মূলের কার্য্য সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

৩। উদ্ভিদের দেহে কাণ্ডের কার্য্য কিরূপ ?

৪। পাতার বিভিন্ন অংশের নাম বল। পাতার প্রধান কাজ কি কি ?

৫। ফুলের বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। ফুলের কার্য্য কি কি ?

দ্বাদশ অধ্যায়

সরল উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর আলোচনা

ইয়েষ্ট, আমিবা ও মস

জীব ও জড়ে কি পার্থক্য তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এইবার আমরা কয়েকটি সরল জীব সম্বন্ধে (জীব বলিতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীকে বুঝায়) আলোচনা করিব।

ইয়েষ্ট (Yeast) :—ইয়েষ্ট **এককোষী উদ্ভিদ্**। যে সমস্ত দ্রবণে চিনির পরিমাণ অত্যধিক থাকে সেইরূপ দ্রবণে ইয়েষ্ট মৃতজীবীর ন্যায় জন্মায়। ফুলের মধুগ্রন্থিতে, ফলে, দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মৃত্তিকায় প্রভৃতিতে ইহাদের অস্থিত্ব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত ইহাদের সচরাচর দেখা যায় না।

কোষ-গঠন (Cell-structure) :—কোষের আকৃতি অনেকটা ডিম্বাকার, কোষ-প্রাচীর অত্যন্ত ক্ষীণ এবং কোষের মধ্যে দানাদার ও ভ্যাকুওলযুক্ত প্রোটোপ্লাজম্ ও একটি নিউক্লিয়স্ থাকে। নিউক্লিয়সটি একটি বৃহৎ ভ্যাকুওলের পরিধিতে থাকে এবং উক্ত ভ্যাকুওলের মধ্যে নিউক্লীয়-জালিকা থাকে বলিয়া উহাকে নিউক্লীয় ভ্যাকুওল বলে। গ্লাইকোজেন, ভলিউটিন দানা ইত্যাদি সাইটোপ্লাজাসর মধ্যে সঞ্চিত খাদ্যরূপে অবস্থান করে।

৪৫নং চিত্র—এককোষী উদ্ভিদ ইয়েষ্ট

পাচন (Digestion) :—ইয়েষ্ট বাহির হইতে খাদ্যবস্তু আহরণ

করে এবং কোষের মধ্যে জটিল খাদ্য উপাদানগুলিকে ভাঙ্গিয়া প্রোটোপ্লাজমের ব্যবহার্য্য সরল খাদ্য উপাদানে পরিণত করে।

শ্বসন (Respiration) :—শ্বাসক্রিয়ার জন্য ইহার কোন বিশেষ যন্ত্র নাই ; সমস্ত কোষটি এই ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এবং সদা সর্ব্বদা গ্যাসের আদান-প্রদান (অম্লজান গ্রহণ ও অঙ্গারাম্ল ত্যাগ) চলিতে থাকে।

রেচন (Excretion) :—রেচনের জন্য বিশেষ কোন যন্ত্র না থাকিলেও ইয়েষ্ট কোষের দূষিত পদার্থগুলি ক্ষীণ কোষপ্রাচীরের মধ্য দিয়া বাহির করিয়া দেয়।

জনন (Reproduction) :—জননের ব্যাপারে এই এককোষী উদ্ভিদ্‌টি তিনটি পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে—অঙ্গজ (vegetative), অযৌন (asexual) ও যৌন (sexual)। **অঙ্গজ জনন** 'মুকুলোদ্গম' (by budding) পন্থায় সংঘটিত হইয়া থাকে। কোষের যে কোন মেরুর নিকট একটি 'মুকুল' উৎপন্ন
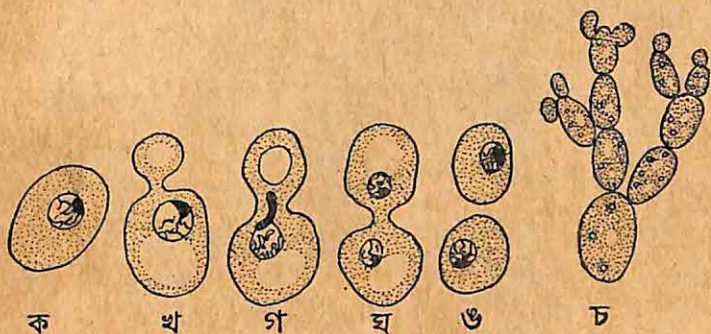
৪৬ নং চিত্র—অঙ্গজ জনন পদ্ধতি

হয় এবং উহার বৃদ্ধির সাথে সাথে নিউক্লিয়স্‌টি দুইটি অপত্য নিউক্লিয়সে বিভক্ত হয়। একটি অপত্য নিউক্লিয়স্‌ 'মুকুলের' মধ্যে চলিয়া যায়। 'মুকুলটি' ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মাতৃকোষ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। অনেক সময় মাতৃকোষ হইতে

বিচ্যুত হইবার পূর্ব্বে অপত্য কোষে নূতন নূতন 'মুকুলের' উদ্ভব হয় (৪৬ নং চিত্রের 'চ' অংশ দেখ)। **অযৌন জনন** 'অ্যাস্কা-রেণু' পন্থায় সংঘটিত হইয়া থাকে। অনুকূল অবস্থায় (অর্থাৎ অম্লজান সরবরাহ অত্যধিক থাকিলে) কোষস্থ বস্তু কতকগুলি **অ্যাস্কা-রেণু** গঠন করে এবং মাতৃকোষটিকে তখন **অ্যাস্‌কস** (ascus) বলে। অবশেষে অ্যাস্‌কসের প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া অ্যাস্কা-রেণু বাহির হয় এবং অনুকূল অবস্থায় 'মুকুলোদ্গম' পন্থায় ইহারা নূতন নূতন ইয়েষ্ট উদ্ভিদের জন্ম দেয়। **যৌন জনন** 'সংশ্লেষ' পন্থায় সংঘটিত হইয়া থাকে। উভয় সংশ্লেষ-কোষ (conjugating cells) হইতে একটি ক্ষুদ্র অংশ বাহির হয় এবং অবশেষে ইহারা সংযুক্ত হইয়া সংশ্লেষ-নালী (৪৮নং চিত্রের 'গ' অংশ দেখ) গঠন

৪৭ নং চিত্র—অযৌন জনন পদ্ধতি
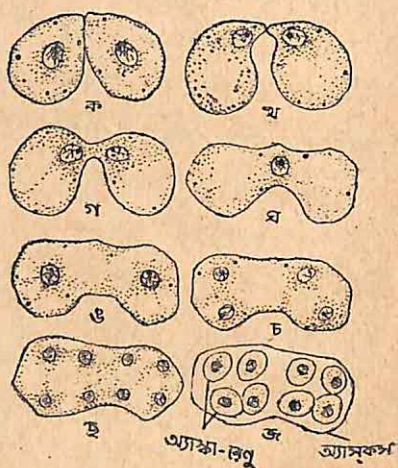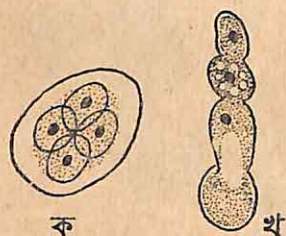
৪৮নং চিত্র—যৌন জনন পদ্ধতি

করে। সংশ্লেষ-কোষের নিউক্লিয়স্ দুইটি এইবার ঐ নালীতে প্রবেশ করে এবং তাহাদের মিলনে একটি নিউক্লিয়সের উদ্ভব হয়। এই ক্রিয়ার পর সংশ্লেষ-নালী বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং অবশেষে কোষটির আকৃতি 'ডাম্বালাকৃতি জাইগোটের' ন্যায় হয়। তারপর কোষটি

আটটি অ্যাস্কা-রেণু গঠন করে এবং মাতৃকোষ অ্যাস্‌কসে পরিণত হয়। অবশেষে অ্যাস্‌কসের প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া অ্যাস্কা-রেণু বাহির হয় এবং অনুকূল অবস্থায় অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে নূতন ইয়েষ্ট উদ্ভিদের জন্ম দেয়।

আমিবা (Amoeba) :—আমিবা **এককোষী প্রাণী**। ইহাদের সাধারণতঃ পুকুরের কাদায় বা পাঁকে পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত ইহাদের সচরাচর দেখা যায় না। এককোষী প্রাণী হইলেও জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি—যেমন গমন, পাচন, শ্বসন, রেচন, জনন ইত্যাদি ক্রিয়া—ইহাদের মধ্যে দেখা যায়।

কোষ-গঠন (Cell-structure) :—কোষের কোন নির্দ্দিষ্ট
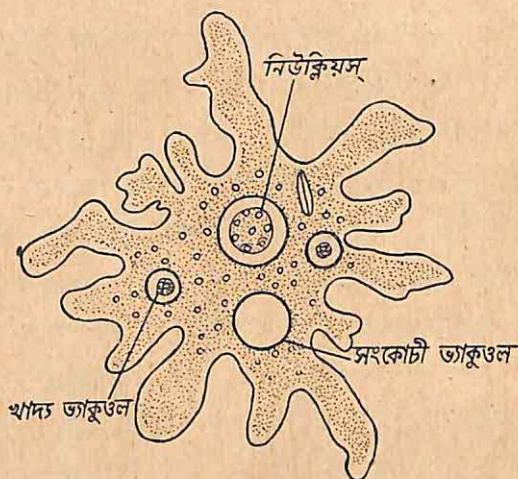
৪৯নং চিত্র—এককোষী প্রাণী আমিবা

আকার নাই। কোষের মধ্যে আছে খাদ্য-ভ্যাকুওল ও সংকোচী-ভ্যাকুওলযুক্ত প্রোটোপ্লাজম্ ও একটি নিউক্লিয়স্।

গমন (Locomotion) :—প্রোটোপ্লাজম্ প্রক্ষেপণে আমিবার

দেহে ক্ষণপাদ উৎপন্ন হয় এবং ইহার সাহায্যে গমনাগমন করে। প্রয়োজনমত এই ক্ষণপাদ আবার বিলুপ্ত হইয়া যায়।
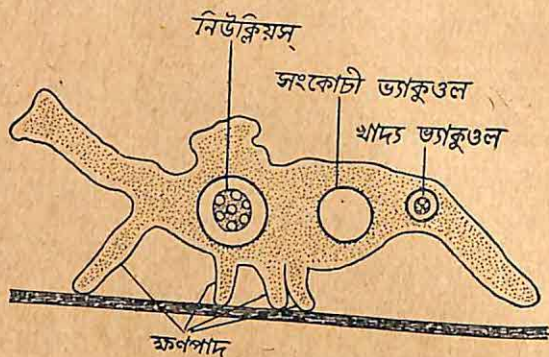
৫০নং চিত্র—আমিবার গমন পদ্ধতি

পাচন (Digestion) জলে অবস্থিত অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্ ও প্রাণী ইহার খাদ্য। আমিবা কোষের মধ্যে জটিল খাদ্য উপাদানগুলিকে ভাঙ্গিয়া প্রোটোপ্লাজমের ব্যবহার্য্য সরল খাদ্য উপাদানে পরিণত করে। সরল খাদ্য উপাদানগুলির সাহায্যে দেহের পুষ্টি সাধিত হয় এবং ইহাদের দহনে যে তাপশক্তির উদ্ভব হয় তাহার দ্বারা আমিবা বিভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করে।

শ্বসন (Respiration) :—শ্বাসকার্য্যের জন্য আমিবার বিশেষ কোন যন্ত্র নাই; সমস্ত দেহ দিয়া এই ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। জলে দ্রবীভূত অম্লজানের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চলে।

রেচন (Excretion) :—রেচনের জন্য বিশেষ কোন যন্ত্র না থাকিলেও আমিবা কোষের দূষিত পদার্থগুলি সেল-ঝিল্লী দিয়া বাহির করিয়া দেয়।

উদ্দীপনায় সাড়া (Response to Stimulus) :—স্পর্শ, শৈত্য, তাপ, আলোক ও অন্যান্য প্রকার উদ্দীপনায় ইহারা সাড়া দেয়। আলপিন দিয়া ইহার দেহের কোন অংশ স্পর্শ করিলে ইহারা

বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়। ২৫০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ইহাদের উত্তেজনা সর্ব্বাধিক হয়; ৩৫০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ইহারা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে এবং ৪০° ডিগ্রা সেন্টিগ্রেডে ইহাদের প্রোটোপ্লাজম্ জমাট বাধিয়া যায়।

জনন (Reproduction):—জননের ব্যাপারে এই এককোষী প্রাণীটি সাধারণতঃ দ্বিভাজন পন্থা অবলম্বন করে। আমিবা যখন পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় তখন ইহার নিউক্লিয়স্ বিভক্ত হইয়া দুইটি অপত্য নিউক্লিয়সের সৃষ্টি করে (৫১ নং চিত্র 'গ' অংশ দেখ)। সাইটোপ্লাজম্ অপত্য নিউক্লিয়সের চারিদিকে আসিয়া জমে; ফলে কোষের মধ্যস্থল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং মাতৃকোষ হইতে দুইটি অপত্য কোষের জন্ম হয়। অপত্য কোষ পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া সাধারণতঃ আবার এই পন্থার দ্বারা নূতন কোষের সৃষ্টি করে।
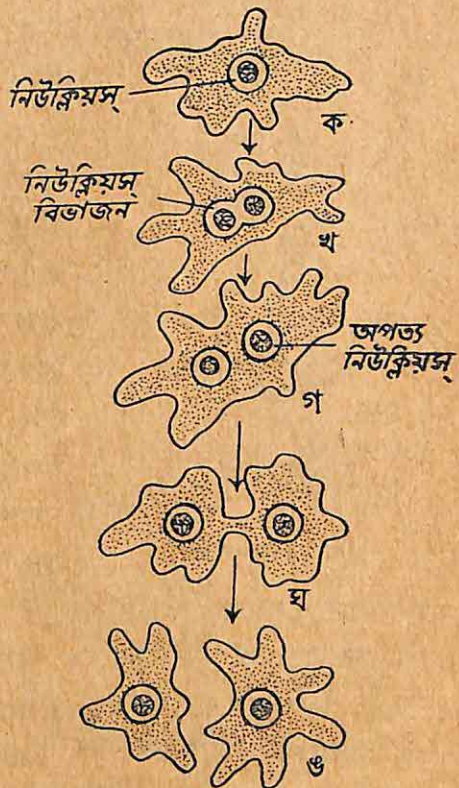
৫১ নং চিত্র—আমিবার জনন পদ্ধতি

মস (Moss):—মস বহুকোষী উদ্ভিদ্ ও ব্রাওফাইটা বা

মসবর্গ শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের আকৃতি ক্ষুদ্র, প্রায় আধ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। এই উদ্ভিদ্‌কে সাধারণতঃ সিক্ত প্রাচীর, ছাদের ও গুঁড়ির ফাটল ইত্যাদি স্থানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে জন্মাইতে দেখা যায়। ইহাদের কাণ্ড ও পাতা আছে কিন্তু প্রকৃত মূল বলিয়া কিছুই নাই। প্রকৃত মূলের পরিবর্ত্তে কাণ্ডের নীচে রাইজয়েড নামক অসংখ্য সূত্র থাকে এবং ইহারা উদ্ভিদ্‌টিকে মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখে এবং মাটি হইতে খাদ্যরস শোষণ করিতে সাহায্য করে। কাণ্ডটি সরু, খর্ব্ব ও শাখান্বিত এবং ইহার উপর অনেক সরল বৃন্তহীন পাতা সন্নিবিষ্ট থাকে। উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতার যাহা কার্য্য মসের কাণ্ড ও পাতা সেগুলি সম্পাদন করে। মস গাছ পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইলে দেহে জননকোষের উৎপত্তি হয় এবং সেইজন্য ইহাদের লিঙ্গধর উদ্ভিদ্ (gametophyte plant) বলে। পুংজননকোষগুলি অ্যানথেরিডিয়া (antheridia) নামক পুংজননযন্ত্রে থাকে এবং স্ত্রীজননকোষগুলি অ্যারচেযোনিয়া (archegonia) নামক স্ত্রীজননযন্ত্রে থাকে। পুংজননকোষ হইতে শুক্রাণু স্ত্রীজননকোষের ডিম্বাণুর সহিত মিলিত হয়। ডিম্বাণু নিষিক্ত হইবার পর ইহার চতুর্দ্দিকে একটি প্রাচীর গঠিত হইয়া **উস্পোর** (oospore) উৎপন্ন হয়। উস্পোর শীঘ্র ভ্রূণে
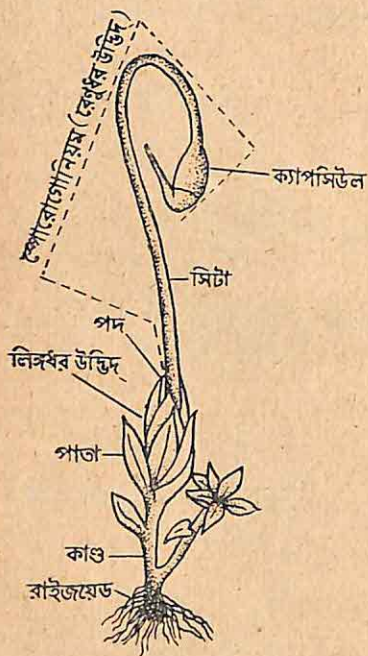
৫২নং চিত্র—মস গাছ

পরিণত হয় এবং ইহা হইতে যথাকালে স্পোরোগোনিয়ম
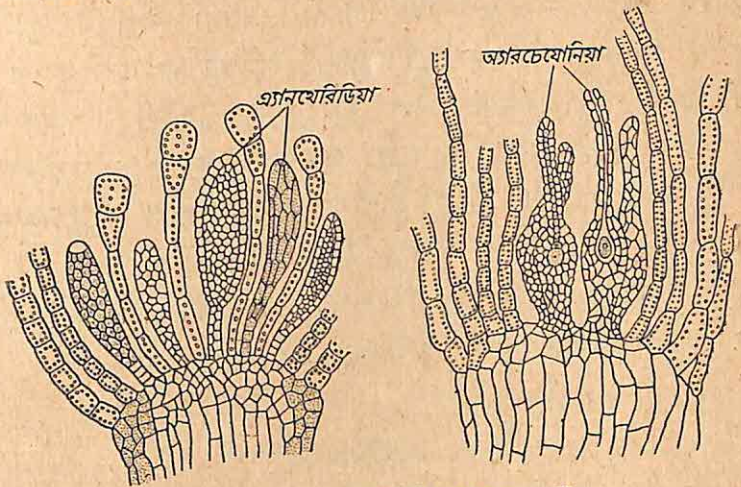
৫৩নং চিত্র—মস গাছের অ্যানথেরিডিয়া ও অ্যারচেযোনিয়া

(sporogonium) উৎপন্ন হয়। পূর্ণাঙ্গ স্পোরোগোনিয়ামের
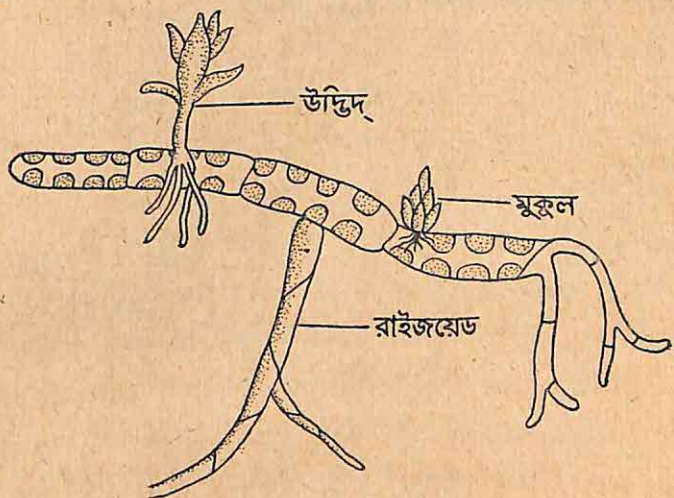
৫৪নং চিত্র—প্রোটোনীমা

তিনটি অংশ থাকে—উপরিভাগে থলির ন্যায় অংশটিকে ক্যাপ্‌সিউল

(capsule), সরু বৃন্তটিকে **সিটা** (seta) ও লিঙ্গধর উদ্ভিদের সহিত সংযুক্ত অংশটিকে **পদ** (foot) বলে। ক্যাপ্‌সিউলের মধ্যে যথাসময়ে অসংখ্য **রেণুর** (spores) উদ্ভব হয় এবং ক্যাপ্‌-সিউলের পরিণত অবস্থায় রেণুগুলি বাহির হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রত্যেক রেণুর অনুকূল অবস্থায় অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং বারংবার কোষ-বিভাগ প্রক্রিয়া দ্বারা **প্রোটোনীমা** (protonima) নামক সবুজ বহু শাখাযুক্ত সূত্র গঠন করে। প্রোটোনীমার পার্শ্বীয় মুকুল হইতে মস গাছ উৎপন্ন হয়। এইরূপে মস গাছের জীবন বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ হয়।

অনুশীলন

১। ইয়েষ্ট উদ্ভিদের জনন সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।
২। আমিবা প্রাণীর গমন ও জনন সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।
৩। মস উদ্ভিদ্‌কে লিঙ্গধর ও রেণুধর উদ্ভিদ্ কেন বলা হয় ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মানবদেহ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে নিম্নস্তরের জীব সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিলাম। এইবার আমরা নরদেহ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। শিল্পী যখন মৃন্ময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, তখন বাঁশ, বাখারি, দড়ি প্রভৃতি দিয়া একখানা শক্ত কাঠামো তৈয়ারী করিয়া লয়। তারপর তাহার উপর প্রয়োজনমত খড়মাটি দিয়া উহাকে তাহার অভিলষিত আকৃতি প্রদান করিয়া থাকে। গঠন শেষ হইলে সে সেই মূর্ত্তিকে নানা রঙে রঞ্জিত করে। মানুষের দেহখানাও প্রায় ঐ প্রণালীতে গঠিত। তোমার হাত অথবা পা টিপিয়া দেখ, কোমল মাংসের নীচে একটা কঠিন পদার্থ রহিয়াছে। উহা আমাদের দেহের কঠিন অস্থিনির্মিত কাঠামো বা **কঙ্কাল**। ছোট, বড়, গোল, চ্যাপ্টা, সরু, মোট ২০৬ খানা হাড়ের সংযোগে নরদেহের কাঠামো গঠিত। কঙ্কালখানা দেহের অন্যান্য কোমল অংশকে ধারণ করিয়া থাকে এবং সমস্ত দেহখানাকে খাড়া করিয়া রাখে। কঙ্কাল না থাকিলে কঙ্কালহীন কেঁচোর মত আমরা মাটির উপর পড়িয়া থাকিতাম এবং অতিকষ্টে নড়াচড়া করিতে পারিতাম। কঙ্কালের উপর আছে কোমল **মাংসপেশী,** তাহার উপর খানিক **চর্ব্বি** এবং সর্ব্বোপরি আছে **ত্বক্** বা **চামড়া**। ত্বকের মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম **রঞ্জনকোষ** দ্বারা ত্বকের রঙ করা হইয়াছে। দেহের বিভিন্ন স্থানের ভিতর দিয়া অসংখ্য **শিরা** ও **ধমনী** জালের মত বিস্তৃত। ইহাদের ভিতর দিয়া রক্ত চলাচল করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম **নার্ভ** আছে। ইহারা আমাদের অনুভূতি ও দেহের বিভিন্ন স্থানের সংবাদ বহন করে।

বাহির হইতে মানবদেহকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়ঃ— (১) **মস্তক**, (২) **দেহকাণ্ড** ও (৩) **প্রত্যঙ্গ**।

১। মস্তক

মস্তক একটি গোলাকার হাড়ের বাক্স বিশেষ। ইহাকে **করোটি** বা **খুলি** বলে। এই খুলির ভিতর **মস্তিষ্ক** আছে। ইহা আমাদের বুদ্ধি, স্মৃতি এবং সকল প্রকার অনুভূতির কেন্দ্র।
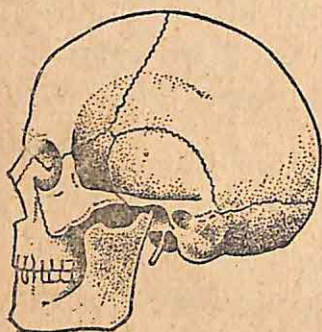
৫৫নং চিত্র—মাথার খুলি (পার্শ্বদেশ)

৫৬নং চিত্র—মাথার খুলি (সম্মুখ)

৮ খানা চ্যাপ্টা হাড় দৃঢ়ভাবে পরস্পর যুক্ত হইয়া মাথার খুলি বা করোটি গঠিত হইয়াছে। করোটির নীচের অংশকে **মুখমণ্ডল** বলে। মুখমণ্ডলে **চক্ষু**, **কর্ণ**, **নাসিকা**, **ওষ্ঠ** ও **মুখগহ্বর** আছে।

চক্ষুর সাহায্যে আমরা বাহিরের জিনিস দেখিতে পাই ; কর্ণের দ্বারা আমরা বাহিরের শব্দ শুনিতে পাই ও নাসিকা দ্বারা আমরা আঘ্রাণ লই এবং ইহা আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পথ। নাসিকা ও চিবুকের মাঝখানে ওষ্ঠ অবস্থিত।

নাসারন্ধ্র ও চিবুকের মধ্যস্থলে যে গহ্বরটি আছে তাহার নাম মুখগহ্বর। ওষ্ঠ ও নাসারন্ধ্র এই গহ্বরের দ্বার স্বরূপ। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মুখের মধ্যে দুই পাটিতে ১৬টি করিয়া ৩২টি দন্ত থাকে (আমাদের জীবনে দুইবার দাঁত বাহির হয়। শিশুদের ছয় সাত

মাস বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে উপর ও নীচের পাটিতে দশটি করিয়া মোট কুড়িটি দাঁত বাহির হয়। এই দাঁতকে দুধে দাঁত বলে। ইহা অস্থায়ী; ছয় সাত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া এই দাঁতগুলি এক এক করিয়া পড়িয়া যায় এবং তাহাদের স্থানে ক্রমশঃ নূতন স্থায়ী দাঁত বাহির হয়)। কর্ত্তন, ছেদন, পেষণ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের জন্য দন্তগুলির আকৃতি ও গঠন বিভিন্ন। উপর ও নীচের পাটির সম্মুখে চারিটি করিয়া আটটি বাটালির মত চ্যাপ্টা **কৃন্তক দন্ত**। ইহার দ্বারা খাদ্যদ্রব্য খণ্ডিত হয়। কৃন্তক দন্তের প্রত্যেক পার্শ্বে একটি করিয়া মোট চারিটি কুকুরের দাঁতের মত সূচ্যগ্র দাঁত আছে, ইহাকে **শ্বদন্ত** বলে। ইহার দ্বারা খাদ্যদ্রব্য ছিন্ন করা যায়। ইহাদের পরবর্ত্তী উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া মোট যে আটটি দাঁত থাকে তাহাকে **চর্ব্বক** দন্ত বলে। তাহার পর উভয় পার্শ্বে তিনটি হিসাবে দুই পাটিতে আরও বারোটি **পেষক** দন্ত আছে। মুখগহ্বরে ভিতর দিকে **গলবিল** অবস্থিত। গলবিলের উভয়পার্শ্বে দুইটি **তালুগ্রন্থি** আছে। গলবিলের উপর যে মাংসপিণ্ড ঝুলিয়া থাকে তাহাকে **আলজিভ** বলে।
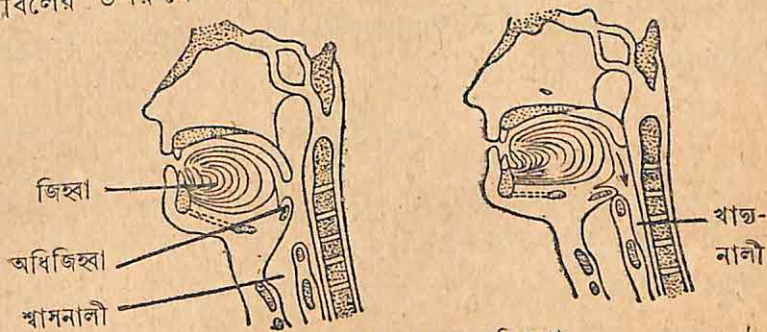
৫৭নং চিত্র—মুখগহ্বরের কতকগুলি অংশ

গলবিলের সহিত **শ্বাসনালী** ও **গলনালী** বলিয়া দুইটি পৃথক নালী সংযুক্ত আছে। শ্বাসনালী অগ্রে ও গলনালী তাহার পশ্চাতে।

গলনালী ও আমাশয়ের মধ্যস্থলের নালীর নাম **খাদ্যনালী**। জিহ্বা গলদেশ হইতে বাহির হইয়া দাঁত পর্য্যন্ত প্রসারিত। জিহ্বার তলদেশ মসৃণ কিন্তু উপরের ভাগ অমসৃণ ও তাহাতে খুব সূক্ষ্ম উঁচু অংশ দেখা যায়। উঁচু অংশগুলিতে **স্বাদকোরক** আছে। জিহ্বার গোড়ায় এবং শ্বাসনালীর উপরে একটি ঢাকনা থাকে, তাহার নাম **অধিজিহ্বা**। খাইবার সময় শ্বাসনালী এই ঢাক্‌না দিয়া বন্ধ হইলে চর্ব্বিত খাদ্য গলনালী দিয়া নামিয়া যায়। মুখগহ্বরের উপরের কঠিন অংশকে **তালু** বলে। ইহার পিছনে আছে **নরম তালু**। এই নরম তালু নাসারন্ধ্রের মুখ বন্ধ করিয়া গলবিল হইতে পৃথক রাখে। খাইবার সময় এই দুই ঢাকনার (অধিজিহ্বা ও নরমতালু) কার্য্যে কোন গোলযোগ ঘটিলে খাদ্যকণা শ্বাসনালী বা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে এবং ইহা বড়ই কষ্টদায়ক হয়। ইহাকে আমরা বলি "বিষম লাগা"।

মুখমণ্ডলে ১৪ খানি হাড় আছে। ইহার মধ্যে ১৩ খানি খুলির সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। অবশিষ্ট ১ খানি আমাদের নিম্নের চোয়াল কব্জার দ্বারা উপরের সহিত সংযুক্ত। মুখমণ্ডলের অন্তর্গত দুই কর্ণে তিনখানি করিয়া ছয়খানি ক্ষুদ্রাস্থি রহিয়াছে। ইহা ছাড়া গলদেশের কণ্ঠনালীতে একখানি অস্থি আছে।

দেহকাণ্ড

দেহের মধ্যাংশকে দেহকাণ্ড বলে। ইহা তিনটি অংশে বিভক্ত —গ্রীবাদেশ, বক্ষস্থল ও উদর। দেহকাণ্ডের প্রধান অস্থির নাম **মেরুদণ্ড**। ইহা গ্রীবা হইতে আরম্ভ করিয়া দেহের পশ্চাৎ ভাগ দিয়া ধড়ের শেষপ্রান্ত শ্রোণি পর্য্যন্ত লম্বিত আছে। ইহা সোজা একখানি হাড় নহে। ইহাতে মোট ২৬ খানি **খণ্ডাস্থি** বা **কশেরুকা** (৫৮ নং চিত্র দেখ) আছে। তন্মধ্যে ঘাড়ে বা গ্রীবায় ৭ খানি,

পৃষ্ঠদেশে ১২ খানি, কোমরে ৫ খানি, বস্তিদেশে ১ খানি (শৈশব অবস্থায় ৫ খানি পৃথক খণ্ডাস্থি থাকে কিন্তু পরিণত বয়সে ইহারা মিলিত হইয়া একখানি খণ্ডাস্থিতে পরিণত হয়) ও গুহ্যদেশে ১ খানি (শৈশব ৪ খানি খণ্ডাস্থি পৃথক থাকে এবং পরিণত বয়সে মিলিত হইয়া একখানি খণ্ডাস্থিতে পরিণত হয়)। **বন্ধনীর** সাহায্যে কশেরুকাগুলি দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। দুইটি কশেরুকার মিলনস্থলে যে ফাঁক থাকিয়া যায় সেখানে তরুণাস্থির গদি থাকে। ইহাতে কশেরুকাগুলি পরস্পর ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। মেরুদণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডাস্থির মধ্যে ছিদ্র আছে। মেরুদণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডাস্থিগুলি পরস্পর ও উপর্য্যুপরি এমনভাবে সাজান আছে যে, উহাদের ছিদ্রগুলি দ্বারা একটি অবিচ্ছিন্ন নলের সৃষ্টি হইয়াছে। মস্তকের পশ্চাদ্দিকে হাড়ের তলায়ও একটা ছিদ্র আছে। মেরুদণ্ডের নল সেই ছিদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। মস্তিষ্ক হইতে এক গোছা নার্ভ মেরুদণ্ডের ঐ নলের ভিতর দিয়া নামিয়া আসিয়াছে। ইহাকে **সুষুম্না-কাণ্ড** বলে। মেরুদণ্ডের হাড়ের পাশে যে ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়া সুষুম্না-কাণ্ড হইতে শাখা-নার্ভ বাহির হইয়া দেহের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে।

গ্রীবার কশেরুকা
পৃষ্ঠের কশেরুকা
কোমরের কশেরুকা
বস্তিদেশের কশেরুকা (৫ খানা জোড়া)
গুহ্যদেশের কশেরুকা (৪ খানা জোড়া)

৫৮নং চিত্র—মেরুদণ্ড

স্কন্ধের পশ্চাদ্দিকে দুই পার্শ্বে দুইখানা চ্যাপ্টা অস্থি আছে।
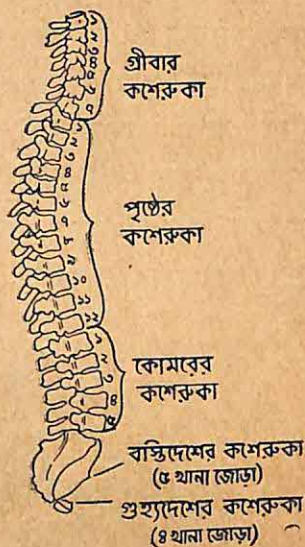
উহার নাম **স্কন্ধাস্থি** বা **অংশফলক**। বক্ষাস্থির উপর হইতে দুইপাশে দুইখানি বাঁকা হাড় পশ্চাতের স্কন্ধাস্থির সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহাদের **অক্ষকাস্থি** বা **কণ্ঠাস্থি** বলে। এই উভয় প্রকার হাড়ের সংযোগে স্কন্ধবেষ্টনী। মেরুদণ্ডের উপরিভাগে যেমন স্কন্ধবেষ্টনী, উহার নিম্নভাগে অর্থাৎ বস্তিতে আর একটি বেষ্টনী আছে। উহাকে বস্তির হাড় বলে। কয়েকখানি অস্থি সংযুক্ত হইয়া উহাদের নীচে একখানি আধারের সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষের ধড়ের অভ্যন্তর মাংসপেশীর দ্বারা নির্ম্মিত একখানা পর্দ্দার দ্বারা বিভক্ত। এই পর্দ্দার নাম **মধ্যচ্ছদা**। মধ্যচ্ছদার উপরের অংশকে **বক্ষ** ও নিম্নাংশকে **উদর** বলে।
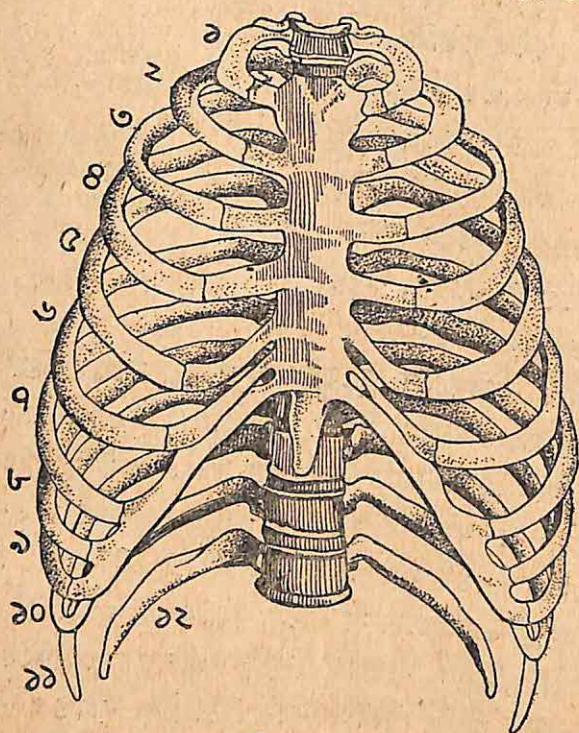
৫৯ নং চিত্র—বক্ষপঞ্জর

বক্ষগহ্বর দেখিতে পিঞ্জরের ন্যায়। ইহার সম্মুখে **উরঃফলক**, পশ্চাদ্ভাগে

মেরুদণ্ডের দ্বাদশটি **কশেরুকা**, দুই পার্শ্বে দ্বাদশ জোড়া **পঞ্জরাস্থি**। প্রত্যেক কশেরুকা হইতে একজোড়া পঞ্জরাস্থি বাহির হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১০ জোড়া পঞ্জরাস্থি উরঃফলকের সহিত তরুণাস্থির সাহায্যে সংযুক্ত হইয়াছে (৫৯ নং চিত্র দেখ)। এই পঞ্জরাস্থিগুলির সম্মুখের অংশ অপেক্ষাকৃত নরম। সেইজন্য নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় আমাদের বক্ষদেশ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে পারে। পঞ্জরাস্থির বাকী ২ জোড়া কাহারও সহিত সংযুক্ত নহে। ইহারা **মুক্ত-পঞ্জর**
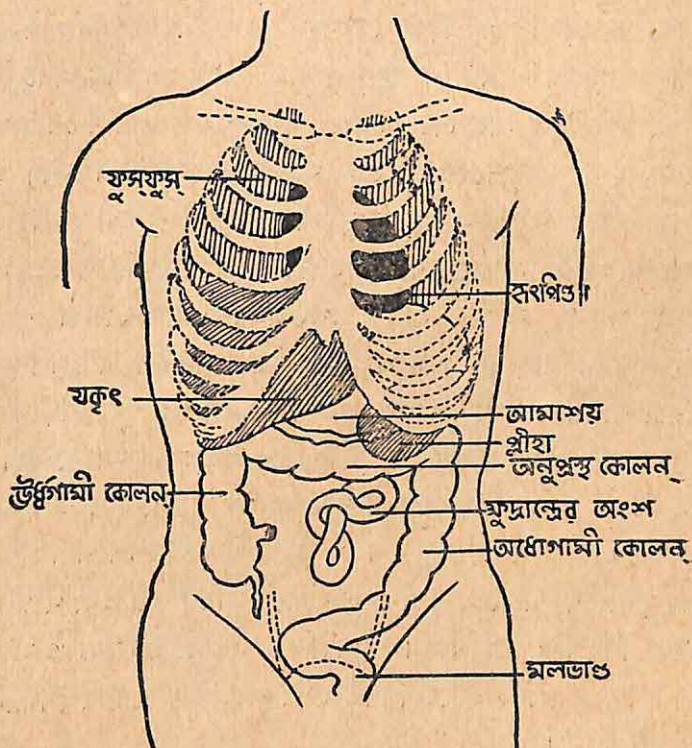
৬০নং চিত্র—দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি

নামে অভিহিত। বক্ষগহ্বরের দুই পার্শ্বে দুইটি গোলাপী রঙের ফুস্‌ফুস্‌ অবস্থিত। ফুস্‌ফুস্‌ দুইটির বামদিকে একটু কাত হইয়া

হৃৎপিণ্ড অবস্থিত। ফুস্‌ফুস্‌ শ্বাসকার্য্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে এবং এইখানে রক্তশোধন কার্য্য সম্পাদিত হয়। ধমনী ও শিরাপথ দিয়া হৃদ্‌যন্ত্র সর্ব্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চালিত করিয়া থাকে। মধ্যচ্ছদার নিম্নাংশ উদর। মধ্যচ্ছদাকে ভেদ করিয়া অন্ননালী উদরের বাম-দিকে অবস্থিত **আমাশয়ের** সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ভুক্তদ্রব্য অন্ননালীর পথ দিয়া আমাশয়ে উপস্থিত হয় এবং তাহার কোন কোন অংশ তথায় জীর্ণ হইয়া থাকে। আমাশয় হইতে ভুক্তদ্রব্য একটা নলের ভিতর দিয়া চালিত হয়। এই নলের নাম **অন্ত্র**। উহার প্রথমাংশটি শেষাংশ অপেক্ষা দীর্ঘ (প্রায় ২০ ফুট) অথচ সরু। প্রথমাংশটি **ক্ষুদ্র অন্ত্র** এবং ইহার অপেক্ষাকৃত মোটা শেষাংশকে **বৃহদন্ত্র** বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয়। উহার অপর অংশ অবশেষে বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করিয়া তাহার শেষ প্রান্ত পায়ু দিয়া মলরূপে বাহির হইয়া যায়। উদরগহ্বরের মধ্যে **যকৃত,** তাহার সহিত সংযুক্ত **পিত্তস্থলী, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা** প্রভৃতি কয়েকটি রস-নিঃসারক **গ্রন্থি** আছে। উহারা ভিন্ন ভিন্ন রস নিঃসরণ করিয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া উদর-গহ্বরে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র আছে, ইহাদের নাম **বৃক্ক**। বৃক্কের সহিত একটি থলি সংযুক্ত আছে, ইহাকে **মূত্রাশয়** বলে। দেহের অনাবশ্যক জল ও আরও কতকগুলি পদার্থ বৃক্কের দ্বারা মূত্ররূপে পরিণত হইয়া সেই থলিতে সঞ্চিত হয় এবং পরে তথা হইতে নির্গত হইয়া যায়। অবশিষ্ট অনাবশ্যক জল ও অন্যান্য পদার্থ ঘর্ম্মরূপে দেহ হইতে নির্গত হয়। আমাদের চর্ম্মে ঘর্ম্ম নির্গমের পথ রহিয়াছে।

৩। প্রত্যঙ্গ

প্রত্যঙ্গ বলিতে মানবদেহের বাহুদ্বয় ও পদদ্বয় বুঝায়। ইহারা দেহকাণ্ডের শাখাস্বরূপ। এই অংশে বিশেষ কোন যন্ত্রের অবস্থান

নাই। প্রত্যেক বাহুর তিনটি অংশ—**প্রগণ্ড, প্রকোষ্ঠ ও হস্ত।** প্রগণ্ডে একখানি গোল লম্বা অস্থি আছে। ইহা স্কন্ধাস্থির প্রান্তে একটা গর্ত্তের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে। প্রকোষ্ঠে দুইখানি লম্বা অস্থি আছে। প্রত্যেক হস্তে ২৭ খানি অস্থি আছে।

প্রত্যেক পদের তিনটি অংশ—**জানু, জঙ্ঘা ও চরণ।** পদের অস্থির সহিত বাহুর অস্থির সাদৃশ্য আছে। জানুতে একখানি গোল অস্থি আছে। ইহা বস্তির হাড়ের গর্ত্তের মধ্যে স্থাপিত। জঙ্ঘায় দুইটি অস্থি আছে। উরু-জঙ্ঘার সন্ধি এরূপভাবে গঠিত যে জঙ্ঘা কেবল পিছন দিকে মুড়িতে পারা যায়। সন্ধির সম্মুখে একখানা চ্যাপ্টা চাক্‌তি আছে ইহার নাম **প্যাটেলা**। প্রত্যেক চরণে ২৬ খানি অস্থি আছে। হাত অপেক্ষা পায়ের হাড়গুলি আকারে বড় ও শক্ত। কারণ পা-ই সমস্ত দেহের ভার বহন করে।

শরীরের বিভিন্ন অংশে ২০৬ খানি অস্থি নিম্নলিখিত অবস্থায় রহিয়াছে :—

করোটি—২২ খানা	পঞ্জর—২৪ খানা	মেরুদণ্ড—২৬ খানা
কর্ণ—৬ খানা		উরঃফলক—১ খানা
কণ্ঠনালী—১ খানা		বস্তি—২ খানা
অক্ষকাস্থি—২ খানা		হস্ত—৩০ × ২ = ৬০
অংশফলক—২ খানা		পদ—৩০ × ২ = ৬০ খানা

অস্থিসন্ধি ও বন্ধনী—এইমাত্র যে অস্থিসমূহের পরিচয় দেওয়া হইল, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলে তাহাদের দ্বারা নরকঙ্কাল বা মানবদেহের কাঠামো গঠিত হইতে পারিত না। সুতরাং অস্থিগুলিকে যথাস্থানে সংযুক্ত করিবার জন্য অন্যপ্রকার বস্তুর প্রয়োজন হয়। **অস্থিসন্ধির** দ্বারা অস্থিগুলির মিলন সাধিত হয়। অস্থিসন্ধি দুই প্রকার—(১) **অচলসন্ধি** ও (২) **সচলসন্ধি।** অচলসন্ধির মধ্যে কতকগুলি মোটেই নড়াচড়া করিতে পারে না;

যেমন মাথার খুলির অস্থিসন্ধি ও বস্তির অস্থিসন্ধি ; আর কতক-গুলি সামান্য নড়িতে পারে, যেমন মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধি। সচল-সন্ধির অস্থিগুলিকে (যেমন হাতের কব্জি, কনুই, হাঁটু) আমরা ইচ্ছামত নানাদিকে ও নানাভাবে নড়াচড়া করিতে পারি ; সচল সন্ধিস্থলে দুইখানি অস্থি দুই দিক হইতে আসিয়া কব্জার মত মিলিত হয়। এই সংযোগস্থল একপ্রকার বন্ধনীর দ্বারা শক্তভাবে বাঁধা থাকে। উহাকে **অস্থিবন্ধনী** বলে। কিন্তু এই বন্ধনের জন্য তাহাদের সঞ্চালনের কোন অসুবিধা হয় না। যেখানে দুইখানি হাড় সংযুক্ত, তাহাদের উভয়ের মধ্যে একখানা করিয়া অপেক্ষাকৃত নরম **তরুণাস্থি** থাকে। উহা গদির কাজ করে। তরুণাস্থির নীচের পর্দ্দাকে সাইনোভিয়ান বলে। ইহা হইতে নির্গত তৈল জাতীয় পদার্থের জন্যই সন্ধিস্থলের অস্থিগুলি সহজেই সঞ্চালিত হইতে পারে এবং ঘর্ষণে কিছুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ঐ তৈলজাতীয় পদার্থ মানবদেহের কঙ্কালের মবিল অয়েল।

মানবদেহের উপাদান :—দেহের বিভিন্ন অংশের ও নানাবিধ যন্ত্রের কথা যাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইল তাহাদের প্রত্যেকরই এক একটা নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে এবং সেই নির্দ্দিষ্ট কাজের উপযোগী করিয়া তাহাদিগকে গঠিত করা হইয়াছে। অস্থি, মাংসপেশী, শিরা, ধমনী, নার্ভ, রক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন মানবদেহের স্থূল অংশ-গুলির মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু জীবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও উহাদের উপাদানগত কোন প্রভেদ নাই। উহাদের সাধারণ উপাদান মাত্র দুইটি—**জীবকোষ** ও **সংযোজক**। সংযোজক জীব-কোষগুলি হইতে নিঃসৃত পদার্থ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীব-দেহের প্রধান উপাদান হইল জীবকোষ। একই জাতীয় কোষগুলি

সংযোজকের দ্বারা পরস্পরের সহিত সংহত হইয়া এক এক প্রকার **তন্তু** নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। অস্থি, মাংসপেশী, নার্ভ প্রভৃতি দেহের স্থূল উপাদানগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির তন্তু।

কোষ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানবদেহের প্রধান উপাদান হইল **কোষ**। নগ্নচক্ষে এদের দেখা যায় না। অণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে প্রত্যেক কোষ যেনএক একটি থলি বিশেষ। এই থলির ভিতরে জেলির ন্যায় একপ্রকার অর্দ্ধতরল (কতকটা স্বচ্ছ) বস্তু আছে, তাহার নাম **প্রোটোপ্লাজম্**। ইহাই কোষের সারবস্তু। ইহার মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম কণিকা আছে।
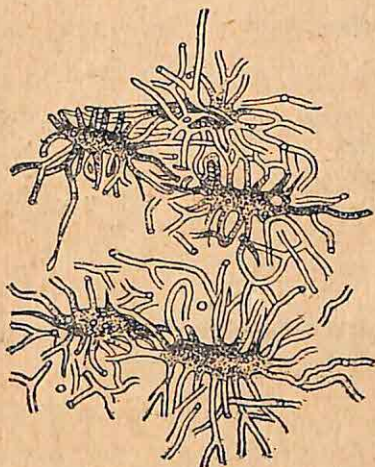
৬১নং চিত্র—শ্বাসনালীর কোষ

কোষের প্রায় মধ্যস্থিত একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, তাহাকে **নিউক্লিয়স্** বলে। এই স্থানে প্রোটোপ্লাজম্ অপেক্ষাকৃত ঘন। নিউক্লিয়স্ প্রোটোপ্লাজমের শাসনকেন্দ্র। বর্দ্ধনশীল জীবকোষগুলি প্রধানতঃ স্বদেহে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া নব নব কোষের সৃষ্টি দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে। জীব-কোষগুলি **লসিকা** দ্বারা পরি-বেশিত ও পরিপুষ্ট হয়।

৬২ নং চিত্র—অস্থিকোষ

তন্তুঃ—একই জাতীয় কোষের সংযোজক দ্বারা পরস্পর

সংহতির ফলে তন্তুর উৎপত্তি হয়। পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে চারি প্রকারের তন্তু দেখা যায় :—

১। **আচ্ছাদক তন্তু**—এই প্রকার তন্তু ত্বকে এবং মুখগহ্বরে, অন্ননালী ও শ্বাসনালী প্রভৃতি যন্ত্রগুলির ভিতরকার গাত্রে থাকে।

২। **সংযোজক তন্তু**—ইহা শরীরের বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া যন্ত্রাদির বিভিন্ন অংশকে বা এক যন্ত্রকে অন্য যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করে। অস্থি, তরুণাস্থি, রক্ত প্রভৃতি তন্তু এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৩। **পৈশিক তন্তু**—মাংস বা পেশীমাত্রেই এই তন্তু থাকে। ইহারই সঙ্কোচন ধর্ম্ম দ্বারা আমরা হস্তপদাদি সঞ্চালন, পরিভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারি।

৪। **নার্ভতন্তু**—মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী এইরূপ তন্তুর দ্বারা গঠিত। মস্তিষ্ক হইতে দেহের অন্যস্থানে এবং দেহের যে কোন স্থান হইতে মস্তিষ্কে উদ্দীপনা পাঠানো ইহাদের কার্য্য। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারাই আমাদের বোধশক্তি হয়।

অনুশীলন

১। মানবদেহের কাঠামো কয়খানি অস্থি দ্বারা গঠিত? উহাদের পরিচয় দাও।

২। মানবদেহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। মানবদেহের উপাদান কি কি? তন্তু কাহাকে কহে? তন্তু কয় প্রকার?

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পাচনতন্ত্র বা পরিপাকতন্ত্র

প্রাণধারণের জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থির করা হইয়াছে যে, আমাদের দেহের বৃদ্ধি, ক্ষতিপূরণ এবং উত্তাপ ও শক্তিসৃজনের জন্য ছয়টি মূল উপাদানের আবশ্যক—**প্রোটিন, শ্বেতসার** ও **শর্করা, চর্ব্বি, লবণ, জল** এবং **ভিটামিন**। আমাদের কোন একটি খাদ্যে ইহাদের সবগুলি থাকে না। সেইজন্য আমাদের প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ এবং আকরিক নানাপ্রকার জিনিস খাইতে হয়। আমরা যে খাদ্য খাই, সকল সময় তাহার সমস্তটাই আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। উহাতে অনাবশ্যক অংশও থাকে। তাহা ছাড়া উহার আবশ্যক অংশটিও উহার স্বাভাবিক অবস্থায় দেহের কাজে লাগে না। সেইজন্য ভুক্তদ্রব্যগুলি আমাদের পরিপাক যন্ত্রের বিভিন্ন স্থান দিয়া ধীরে ধীরে চালিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নিঃসৃত নানাপ্রকার পাচক রসের সহিত মিশ্রিত হয়। তাহার ফলে উহাতে নানারূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে। শেষ পর্য্যন্ত উহা তরল আকারে রক্তের সঙ্গে মিশিয়া বিভিন্ন জীবকোষে নীত হইয়া থাকে। এই সকল প্রক্রিয়াকে **পাচনক্রিয়া** বলে।

দেহকাণ্ডস্থ এক দীর্ঘ নালীর মধ্যে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, ইহার নাম **পৌষ্টিক নালী**। ইহা মুখবিবর হইতে পায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার প্রধান চারিটি অংশ আছে—মুখগহ্বর, খাদ্যনালী, আমাশয় ও অন্ত্র। খাদ্য এই চারিটি অংশের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইবার কালে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয় এবং ইহাকেই পাচন ক্রিয়া বলে।

১। মুখের মধ্যে ক্রিয়া

খাদ্য প্রথমে মুখের মধ্যে জিহ্বার সাহায্যে দন্তদ্বারা চর্ব্বিত, কর্ত্তিত ও পিষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হয়। আমাদের মুখের মধ্যে তিন জোড়া **লালা নিঃসারক গ্রন্থি** আছে ঃ—(ক) কর্ণদ্বয়ের নিকটবর্ত্তী **প্যারাটিড্** গ্রন্থিদ্বয়, (খ) নিম্ন চোয়ালের গাত্রলগ্ন **সাব-ম্যাক্সিলারী** গ্রন্থিদ্বয় ও (গ) জিহ্বার তলদেশস্থিত **সাব-লিঙ্গুয়াল** গ্রন্থিদ্বয়। এই সকল গ্রন্থি হইতে চর্ব্বণের সময় প্রচুর পরিমাণে **লালা** বা রস নিঃসৃত হয়। লালা খাদ্যদ্রব্যকে নরম, সিক্ত ও পিচ্ছিল করে। ইহাতে আমরা সহজে খাদ্য গলিতে পারি। তাহা ছাড়া সেই লালার মধ্যে **টায়ালিন** নামক এক-প্রকার কিণ্বসত্ত্ব আছে। এই কিণ্বসত্ত্ব খাদ্যের অদ্রবণীয় শ্বেতসারকে দ্রবণীয় যবশর্করায় পরিণত করে। একখণ্ড রুটি বা এক মুঠা খই মুখের মধ্যে দিলে প্রথমেই উহা মিষ্ট লাগে না; কিছুক্ষণ পরে উহা শর্করায় পরিবর্ত্তিত হইলে তাহার মিষ্টস্বাদ অনুভূত হইয়া থাকে। খাদ্য চর্ব্বিত হইলে আমরা গলাধঃকরণ করি এবং সেই সময় কণ্ঠদেশের সঙ্কোচন হেতু অধিজিহ্বা বায়ুনালীর ঊর্দ্ধমুখে নীত হয়। সেই অল্প সময়ের জন্য ঢাক্‌নিখানির দ্বারা বায়ুনালী ঊর্দ্ধমুখে আবৃত হয় এবং শ্বাসকার্য্য বন্ধ থাকে। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই সুচর্ব্বিত লালামিশ্রিত খাদ্য ঐ **ঢাক্‌নির উপর দিয়া আসিয়া খাদ্যনালীর মধ্যে পতিত হয়।** খাদ্যনালীর ভিতর দিয়া খাদ্য **আমাশয়ে** উপস্থিত হয়।
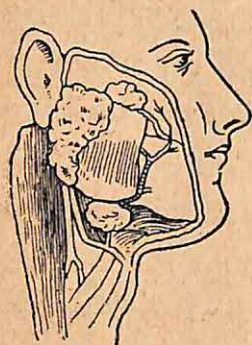
৬৩নং চিত্র—লালাগ্রন্থি

২। আমাশয়ের মধ্যে ক্রিয়া

আমাশয় একটি থলির আকারবিশিষ্ট। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ ফুট ও প্রস্থে চার হইতে পাঁচ ইঞ্চি। ইহা আমাদের বক্ষস্থলের নীচে উদরের বামপার্শ্বে অবস্থিত। ইহা মাংসপেশীযুক্ত একখানা পর্দ্দা দ্বারা নির্ম্মিত। **আমাশয়ের তিন অংশ**—(ক) **আগম দ্বার** বা যেখানে খাদ্যনালী আমাশয়ে প্রবেশ করে, (খ) **আমাশয় স্কন্ধ** বা মধ্যভাগ ও (গ) **নিগম দ্বার**। ইহার প্রান্তদেশ হইতে ক্ষুদ্রান্ত্র আরম্ভ।
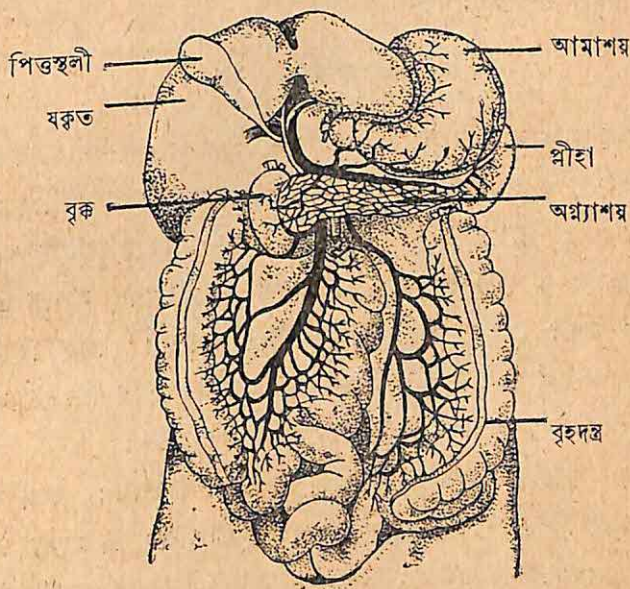
৬৪ নং চিত্র—পাচনক্রিয়ার যন্ত্রাদি

আমাশয়ের ভিতরকার গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। এই সকল গ্রন্থি হইতে এক প্রকার পাচক রস নির্গত হয়। এই রসকে **আমাশয় রস** বলে। ইহা একপ্রকার পাতলা অম্লরস এবং উহাতে তিনটি কিণ্বসত্ত্ব আছে—**হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড, পেপ্‌সিন** ও **রেনিন্‌**। আমাশয় ইহাদের সাহায্যেই প্রোটিনজাতীয় খাদ্যকে

আংশিকভাবে জীর্ণ করে। খাদ্যের সহিত যে সকল জীবাণু আমাশয়ে প্রবেশ করে তাহারা আমাশয়ের অম্লরসে বিনষ্ট হয়। এইরূপে দেহ ব্যাধি হইতে রক্ষা পায়। আমাশয়ের মধ্যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুক্তদ্রব্য থাকে ততক্ষণ ইহা আমাশয়ের প্রাচীরের পেশীগুলির সঙ্কোচের ফলে উক্ত রসের সহিত আন্দোলিত ও মথিত হইতে থাকে। ভুক্তদ্রব্য **মণ্ডের** আকার ধারণ না করা পর্য্যন্ত এই আন্দোলন ও মন্থন ক্রিয়া চলিতে থাকে, ইহাকে আমাশয়ের **মন্থন-ক্রিয়া** বলে।

৩। অন্ত্রের মধ্যে ক্রিয়া

ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে আংশিকভাবে জীর্ণ ও মণ্ডে পরিণত হইবার পর আমাশয় ও অন্ত্রের মধ্যস্থিত পেশীনির্ম্মিত কপাট খুলিয়া যায় এবং ঐ মণ্ড অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। অন্ত্রের দুইটি অংশ (ক) **ক্ষুদ্রান্ত্র** ও (খ) **বৃহদন্ত্র**। উভয় অন্ত্রই পরস্পর সংলগ্ন এবং ইহাদের মধ্যে একটি পেশীনির্ম্মিত ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রের উপরিস্থিত কপাটের নাম **ইলিওসিকেল ভাল্‌ভ**। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়াই জীর্ণ দ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে।

(ক) **ক্ষুদ্রান্ত্র**—ক্ষুদ্রান্ত্র একটি ফাঁপা নলবিশেষ। ইহা সরু বলিয়া ক্ষুদ্র কিন্তু দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় ২০ ফুট। উদরের মধ্যে ইহা কুণ্ডলী আকারে অবস্থিত; চলতি কথায় ইহাকেই নাড়িভুঁড়ি বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের তিনটি অংশ :—(অ) **ডিওডেনাম,** এই অংশটি আমাশয়ের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং ইহার মধ্যস্থিত ছিদ্রের সহিত সংযুক্ত নলের সাহায্যে যকৃত ও অগ্ন্যাশয় হইতে পাচকরস অন্ত্রে পৌঁছায়। দৈর্ঘ্যে ইহা ১০ হইতে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। (আ) **জেজুনাম,** ডিওডেনাম বাদ দিলে সমগ্র ক্ষুদ্রান্ত্রের অবশিষ্টাংশের ইহা $\frac{২}{৫}$ ভাগ ও (ই) **ইলিয়াম** $\frac{৩}{৫}$ ভাগ মাত্র। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরকার

গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। এই সকল গ্রন্থি হইতে একপ্রকার পাচক রস বাহির হয়। এই রসকে ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষরিত **আন্ত্রিক রস** বলে।
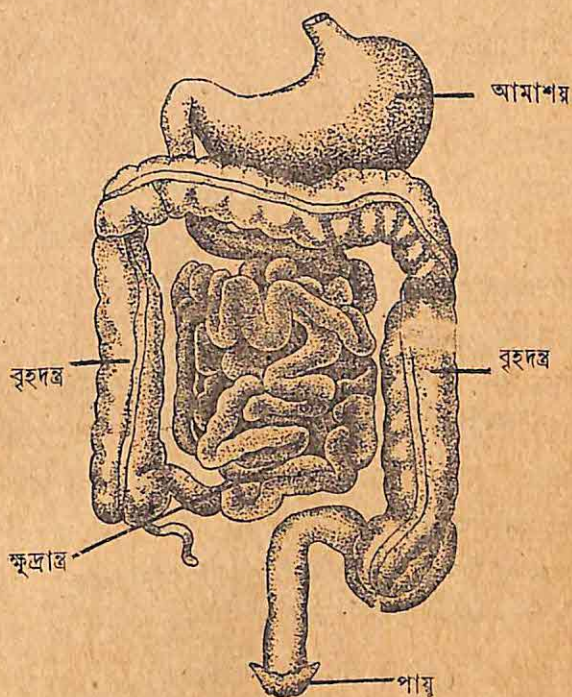
৬৫ নং চিত্র—আমাশয় ও অন্ত্র

আমাশয় হইতে আগত আংশিকভাবে জীর্ণ ভুক্তদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর কতকগুলি পাচকরসের সাহায্যে আরও জীর্ণ হয়। তিনপ্রকার পাচকরস ক্ষুদ্রান্ত্রের ঐ সকল জীর্ণ দ্রব্যের উপর কার্য্য করে—যকৃত হইতে নিঃসৃত **পিত্তরস**, অগ্ন্যাশয় হইতে নিঃসৃত **অগ্ন্যাশয় রস** ও ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্র হইতে ক্ষরিত **আন্ত্রিক রস**। যকৃত হইতে নিঃসৃত **পিত্তরসে** কোন কিণ্বসত্ত্ব নাই। ইহা **অগ্ন্যাশয়**

রসকে ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে কার্য্য করিতে সাহায্য করে। ইহা চর্ব্বি শোষণ কার্য্যের সহায়ক এবং দেহ হইতে নানাপ্রকার বিষাক্ত দ্রব্য বাহির করিয়া দেয়।

অগ্ন্যাশয় রসে নিম্নলিখিত কিণ্বসত্বগুলি আছে ঃ—(১) **ট্রিপ্‌সিন**—ইহা প্রোটিনাংশের উপর কার্য্য করে এবং প্রোটিনাংশের জটিল অবস্থা হইতে তাহাকে সরল অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করে। (২) **এমাইলেজ**—ইহা শ্বেতসার ও শর্করার উপর কার্য্য করিয়া সরল শর্করায় পরিণত করে। (৩) **লিপেজ**—ইহা চর্ব্বিজাতীয় অংশের উপর কার্য্য করিয়া তাহাকে পূর্ণরূপে জীর্ণ করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের পাচক রসে নিম্নলিখিত কিণ্বসত্বগুলি আছে—(১) **ইরেপ্‌সিন**—ইহা প্রোটিনাংশের উপর কার্য্য করে এবং ট্রিপসিনের সহিত একযোগে তাহাকে **এমাইনো এ্যাসিডে** পরিবর্ত্তিত করে। (২) **এণ্টারোকাইনেজ**—ই । ট্রিপ্‌সিনকে প্রোটিনাংশের উপর কার্য্য করিতে সাহায্য করে। (৩) **ইন্‌ভার্টেজ**—ইহা জটিল শর্করাগুলি সরল করিতে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া অগ্ন্যাশয় রসে **ম্যালটেজ ও ল্যাকটেজ** নামে আরও দুইটি কিণ্বসত্ব আছে এবং তাহারা শর্করাংশকে সরল করিতে সাহায্য করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে চর্ব্বিজাতীয় অংশ সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয় এবং অন্যান্য অংশের পরিপাক ক্রিয়া শেষ হয়। ইহার ভিতর সূক্ষ্ম শুঁয়ার ন্যায় কতকগুলি **শোষক-যন্ত্র** আছে। তাহাদের সাহায্যে জীর্ণ দ্রব্যের সারাংশ শোষিত হইয়া **রক্তকৈশিকার মধ্যে প্রবেশ করে এবং দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয়**। শোষিত খাদ্য দেহকোষগুলিতে পৌঁছাইয়া দেওয়া রক্তের একটি প্রধান কাজ। রক্ত এই কাজ করিয়া ফিরিবার সময় দেহকোষগুলির পরিত্যক্তাংশ সংগ্রহ করিয়া ফুস্‌ফুস্, বৃক্ক ও চর্ম্মের ছিদ্রপথ দিয়া বাহির করিয়া দেয়। খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ ক্রিয়া ধীরে ধীরে সাধিত হইয়া থাকে ; সুতরাং ভুক্তবস্তু অন্ত্রের

মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে চালিত হওয়া আবশ্যক। এইজন্য ক্ষুদ্রান্ত্র একটি দীর্ঘ নল ও উহা জড়ান অবস্থায় থাকে।

(খ) **বৃহদন্ত্র**—এই অন্ত্র অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ফুট। ইহা ক্ষুদ্রান্ত্রকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার চারিটি অংশ—(ক) **সিকম্‌** ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, (খ) **কোলন্‌** বৃহদন্ত্রের একটি প্রধান অংশ; ইহার আবার তিনটি বিভাগ আছে—(১) উর্দ্ধগামী কোলন্‌, (২) অনুপ্রস্থ কোলন্‌ ও (৩) অধোগামী কোলন্‌; (গ) কোলনের পর **মলভাণ্ড** এবং (ঘ) সর্ব্বশেষে **মলদ্বার**।

ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে জীর্ণাবশিষ্ট খাদ্য আংশিক তরল অবস্থায় বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। এখানে কোন পাচকরসের নিঃসরণ হয় না। খাদ্যের জলীয় অংশ এবং কিছু লবণ এখানে শোষিত হয়। অতঃপর খাদ্যের পরিত্যক্তাংশ **মলভাণ্ডে** উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত মলের আকারে পায়ু দিয়া বাহির হইয়া যায়।

অনুশীলন

১। পরিপাক ক্রিয়ার প্রয়োজন কি?

২। আমাদের দেহের পরিপাকযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম কর ও উহাদের প্রত্যেক অংশের কার্য্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্বাসতন্ত্র

শ্বাসকার্য্য:—জীবনধারণের জন্য প্রাণীমাত্রেরই খাদ্য, জল ও বায়ুর প্রয়োজন। খাদ্য ও জল না হইলে কিছুদিন প্রাণধারণ করিতে পারা যায়, কিন্তু বাতাস না হইলে আমরা কয়েক মিনিটের বেশী জীবিত থাকিতে পারি না। সেইজন্য শ্বাসকার্য্য জীবদেহের

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়া। পর্য্যায়ক্রমে বক্ষপ্রাচীরে বিস্ফারণ ও সঙ্কোচনই শ্বাসকার্য্য। এই কার্য্যের দ্বারা বায়ু ফুস্‌ফুসের মধ্যে গমন করে এবং পুনরায় ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির হইয়া আসে।
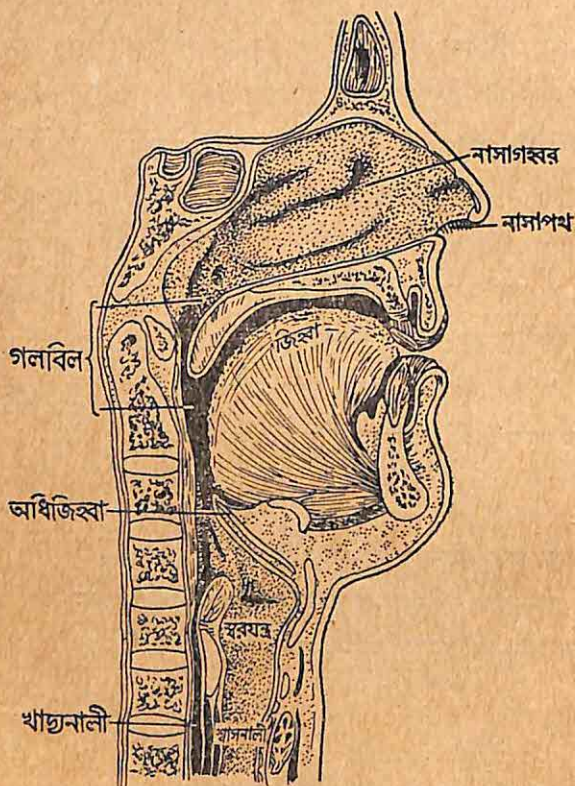
৬৬ নং চিত্র—শ্বাসযন্ত্রের কতকগুলি অংশ

বক্ষপ্রাচীর বিস্ফারিত করিয়া বাহ্য জগৎ হইতে ফুস্‌ফুসের মধ্যে বায়ু লওয়াকে **শ্বাসগ্রহণ** এবং বক্ষপ্রাচীর সঙ্কুচিত করিয়া ফুস্‌ফুস হইতে বাহ্য জগতে বায়ু ত্যাগ করাকে **শ্বাসত্যাগ** কহে। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ সমষ্টির নাম **শ্বাসকার্য্য**।

প্রধানতঃ পাঁচটি যন্ত্র সাহায্যে শ্বাসকার্য্য সম্পাদিত হয়—(১) **নাসাপথ,** (২) **গলবিল,** (৩) **স্বরযন্ত্র,** (৪) **শ্বাসনালী** ও (৫) **ফুস্‌ফুস্‌**।

(ক) **নাসাপথ**—আমরা প্রধানতঃ নাক দিয়া শ্বাসগ্রহণ করিয়া থাকি। নাক বন্ধ থাকিলে মুখ দিয়াও শ্বাস লইতে হয়; কিন্তু মুখ দিয়া প্রশ্বাস লওয়া অস্বাস্থ্যকর, কারণ নাকের মধ্যে বাতাস ছাঁকিয়া লওয়ার ব্যবস্থা আছে, মুখের মধ্যে নাই। ইহা ছাড়া বাহির হইতে আমরা যে বাতাস টানিয়া লই তাহাকে গরম করাও নাসাপথের আর একটি কাজ।

(খ) **গলবিল**—ইহা মাংসপেশী নির্ম্মিত একটি নল। ইহা শ্বাসনলের ও খাদ্যনলের সংযোগস্থল। ইহার মধ্য দিয়া বায়ু নাসিকা হইতে ফুস্‌ফুসে গমন করে। এই নলটির দুইপাশে যে ছোট গ্রন্থি দেখা যায় তাহার নাম **তালুগ্রন্থি**। উপরাংশে ছোট জিহ্বার মত যে মাংসটি ঝুলিতেছে তাহাকে বলে **আল্‌জিভ**।

(গ) **স্বরযন্ত্র**—ইহা তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত। ইহার আকৃতি অনেকটা ত্রিকোণাকার। গলবিলের পরেই শ্বাসনালীর প্রথমাংশে স্বরযন্ত্র অবস্থিত। এই যন্ত্রের ছিদ্রের উপর **অধিজিহ্বা** নামক একপ্রকার ঢাক্‌না আছে। আমরা যে সময় খাদ্য গ্রহণ করি তখন এই ঢাক্‌নাই স্বরযন্ত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। স্বরযন্ত্রের দুইধারে দুইটি অতি পাতলা পর্দ্দার মত সামগ্রী আছে, তাহাদিগকে **ভোকাল কর্ড** বলে। ইহাদের কম্পন হইতে কণ্ঠস্বরের সৃষ্টি হয়। **প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া গলনালী হইয়া স্বরনালীতে পৌঁছিবার পর শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে।**

শ্বাসনালী—স্বরযন্ত্রের তলদেশ হইতে ইহা ফুস্‌ফুস্‌ পর্য্যন্ত বিলম্বিত থাকে। ইহা তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত। তরুণাস্থিগুলি ইহার উপর চক্রাকারে সজ্জিত থাকে। শ্বাসনালীর ১৬টি হইতে

২০টি উপাস্থির আংটি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাসনল কিছুদূরে নামিয়া দুইটি ব্রঙ্কাসে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রঙ্কাস্ আবার বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম নালিকায় ও তাহাদের শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেকটি কোষ ফাঁপা, বায়ুপূর্ণ এবং সঙ্কোচন ও প্রসারণশীল। ইহাদের ফাঁকে ফাঁকে বহুসংখ্যক রক্তজালক আছে।

(ঙ) **ফুস্‌ফুস্**—দুইটি ব্রঙ্কাস্ হইতে ফুস্‌ফুস্ দুইটি গঠিত হইয়া বক্ষপিঞ্জরের মধ্যে মধ্যচ্ছদার উপর স্থাপিত আছে। দক্ষিণ
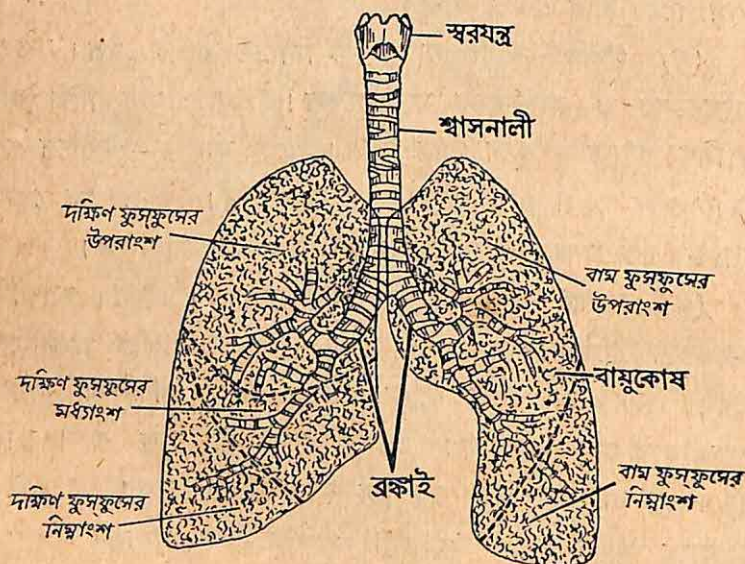
৬৭নং চিত্র—ফুস্‌ফুসের ব্রঙ্কাই ও বায়ুকোষ

ফুস্‌ফুস্ তিনখণ্ডে এবং বাম ফুস্‌ফুস্ দুইখণ্ডে বিভক্ত। **প্লুরা** নামক পাতলা রক্তস্রাবী আবরণ দ্বারা ইহারা আবৃত। বায়ুনালিকা, বায়ুকোষ ও রক্তজালক দ্বারা ফুস্‌ফুস্ গঠিত; সেইজন্য ইহা ফোঁপরা। প্রশ্বাসবায়ু প্রথমে নাসাপথ দিয়া প্রবেশ করে এবং শ্বাসনল ও ব্রঙ্কাসের ভিতর দিয়া শেষ পর্য্যন্ত ফুস্‌ফুসের

বায়ুকোষে উপস্থিত হয়। রক্ত যখন ফুস্‌ফুসের জালকের মধ্যে যায়, তখন ইহার হিমোগ্লোবিন বায়ুকোষের সূক্ষ্ম পর্দ্দার ভিতর দিয়া কোষমধ্যস্থ বায়ু হইতে অম্লজান শোষণ করিয়া লয় এবং অঙ্গারাম্ল কোষের মধ্যে পরিত্যাগ করে। ইহার পর ফুস্‌ফুস্‌ সঙ্কুচিত হয়, তখন এই অঙ্গারাম্লযুক্ত দূষিত বায়ু নিশ্বাসরূপে নাসাপথ দিয়া বাহির হইয়া যায়।

অনুশীলন

১। শ্বাসযন্ত্রের গঠন ও তাহার কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

ষোড়শ অধ্যায়

রেচন তন্ত্র

দূষিত পদার্থ ত্যাগ করা জীবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানবদেহ হইতে মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ও নিঃশ্বাস বায়ু—এই চারিটি রেচ (excreta)—অন্ত্র, বৃক্ক, ত্বক্‌ ও ফুস্‌ফুস্‌ সাহায্যে দেহ হইতে পরিত্যক্ত হয়। পাচনতন্ত্র ও শ্বাসতন্ত্র আলোচনাকালে মলের কথা ও নিঃশ্বাস বায়ুর কথা বর্ণিত হইয়াছে। এইবার আমরা বৃক্ক ও ত্বকের বিষয় আলোচনা করিব।

বৃক্ক ঃ—উদরের মধ্যে মেরুদণ্ডের তুই পার্শ্বে প্রায় চারি ইঞ্চি লম্বা সীমবীজের আকারের তুইটি যন্ত্র আছে, তাহাদিগের নাম **বৃক্ক** বা **কিডনী**। প্রত্যেক বৃক্ক হইতে এক একটি নল (ureter—প্রায় ১০।১২ ইঞ্চি লম্বা) তলপেটে অবস্থিত **মূত্রথলির** (bladder) সহিত সংযুক্ত।

বৃক্কের কার্য্য ঃ—জীবনক্রিয়ার ফলে দেহের বিভিন্ন অংশে

নানাবিধ দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয়। রক্ত সেই সকল পদার্থ শোষণ করিয়া বৃক্কে উপস্থিত হইলে বৃক্কের কোষগুলি রক্ত হইতে দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেয় এবং তাহা মূত্রে পরিণত করে। বৃক্কের দ্বারা নিয়ত মূত্র প্রস্তুত হইয়া মূত্রথলিতে সঞ্চিত হয়। মূত্রথলির গায়ে পেশী আছে। তাহাদের সঙ্কোচনের ফলে মূত্রত্যাগ হয়।
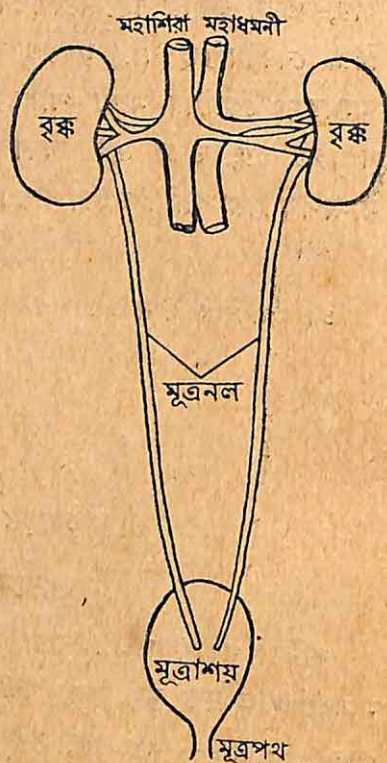
এই কার্য্য ব্যতীতও বৃক্ক অন্যান্য কার্য্য করে। ইহা রক্তের ক্ষারত্ব বজায় রাখিতে সাহায্য করে এবং রক্তরসের (blood plasma) বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত নিয়ন্ত্রিত রাখে।

৬৮ নং চিত্র—বৃক্ক, মূত্রনল ও মূত্রাশয়

ত্বক্ :—ত্বক্ বা চর্ম্ম আমাদের সমস্ত দেহকে আচ্ছাদিত করিয়া আছে। ইহা আমাদের দেহের বহিরাবরণ। সাধারণতঃ ইহার তিনটি স্তর আছে—(ক) **উপচর্ম্ম**—ইহা ত্বকের বাহিরের স্তর ও ঘন আচ্ছাদক তন্তু দিয়া গঠিত। ইহাতে অসংখ্য ঘর্ম্মকূপ ও লোমকূপ আছে; কিন্তু কোন শিরা বা ধমনী নাই। ঘর্ষণের ফলে এই স্তর নিত্যই উঠিতেছে এবং দ্রুত নূতন হইতেছে। এই স্তরেই কড়া ও ফোস্কা পড়ে ও ঘামাচি হয়। রক্তবহা-নালী নাই বলিয়া ফোস্কা বা কড়া ছিড়িয়া ফেলিলেও রক্ত বাহির হয় না। এই স্তরে নার্ভও নাই,

সেইজন্য ছুঁচ ফুটাইলেও লাগে না। (খ) **বর্ণকোষ ত্বক্**—ইহাই আসল চর্ম্মের উপরের স্তর। এই স্তরে রঞ্জনকোষ অবস্থিত এবং
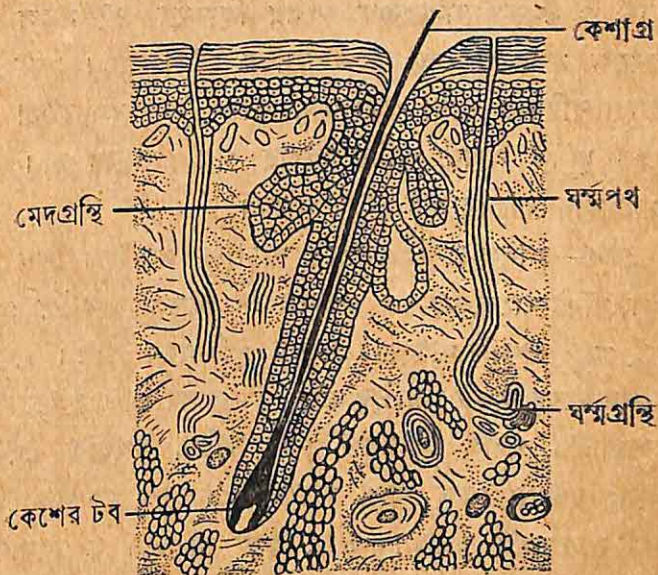
৬৯নং চিত্র—ত্বক্

এই রঞ্জনকোষগুলির মধ্যে এক প্রকার রঙ থাকে। দেহের বর্ণ এই রঙের উপর নির্ভর করে। (গ) **চর্ম্ম**—ইহা ত্বকের ভিতরকার স্তর এবং স্থিতিস্থাপক আচ্ছাদক তন্তু দিয়া গঠিত। এই স্তরে বহুসংখ্যক নার্ভ, শিরা ও ধমনী, মেদগ্রন্থি, ঘর্ম্মগ্রন্থি, কেশের মূল প্রভৃতি আছে। ত্বকের নার্ভ দিয়া সাড়া মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তাহা হইতে আমাদের স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। সেইজন্য ত্বকের অপর নাম স্পর্শেন্দ্রিয়। শিরা ও ধমনীর দ্বারা ত্বকের মধ্যে রক্তসঞ্চালন ও পুষ্টিসাধন হয়।

ঘর্ম্মগ্রন্থি—এই জাতীয় অসংখ্য গ্রন্থি ত্বকের সকল স্থানে বিশেষতঃ হাতে ও পায়ের তলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নলসমূহ ঘর্ম্মগ্রন্থি হইতে আরম্ভ করিয়া ত্বকের উপচর্ম্মের ঘর্ম্মকূপ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। দেহাভ্যন্তরের কতকগুলি দূষিত পদার্থ ও দেহের অনাবশ্যক জলের কিয়দংশ এই সকল নলের সাহায্যে ঘর্ম্মরূপে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। এই সকল ঘর্ম্মকূপ পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন, কারণ ইহা বন্ধ হইয়া গেলে দেহের দূষিত পদার্থ বাহির হইবার পথ পাইবে না। ফলে নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হইতে পারে।

কেশ—আসল চর্ম্মের ভিতরে ঘামাচির মত টবে এক একটি কেশ প্রবিষ্ট থাকে, ইহাকে **কেশের টব** বলে। এই টবের মধ্যে নার্ভ, ধমনী প্রভৃতি থাকিয়া কেশের পুষ্টিসাধন করে। মেদগ্রন্থি কেশের টবের নিকট অবস্থিত এবং এই সকল গ্রন্থি হইতে নির্গত তৈলজাতীয় পদার্থ লোমকূপ ভেদ করিয়া উপচর্ম্মে পৌঁছায়। তজ্জনই চর্ম্ম ও কেশ মসৃণ থাকে। প্রত্যেক কেশের গোড়ায় একটি মাংসপেশী থাকে। ভয়ে, সুখে বা হর্ষে যে রোমাঞ্চ হয়, তাহা ঐ পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া কেশগুলিকে খাড়া করারই ফল।

ত্বকের কার্য্য:—ত্বক্ বহু কার্য্য সাধন করে—(১) ঘর্ম্মের উৎপাদন ও নিষ্কাশন করিয়া শরীরের অভ্যন্তরস্থ দূষিত মল নিঃসরণ করে। (২) অসংখ্য শিরা ও ধমনীর সাহায্যে ত্বক্ শরীরের তাপের সমতা রক্ষার সহায়তা করে। (৩) শরীরের অভ্যন্তরস্থ কোমল অংশকে অনাহত অবস্থায় রাখে এবং জীবাণুকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। (৪) ত্বক্ দিয়া তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া চর্ম্মকে মসৃণ রাখে। (৫) উহা আংশিকভাবে বায়ু হইতে অম্লজান গ্রহণ করে ও তৈল, ঔষধাদি পদার্থ বিশোষণ করিয়া আংশিকভাবে খাদ্যগ্রহণের কার্য্য করে। (৬) ত্বকে অন্তর্মূল নার্ভ সমূহ অবস্থিত বলিয়া উহার অনুভূতি মস্তকে গমন করিয়া স্পর্শবোধ জন্মায়

কতকগুলি সাধারণ ব্যাধি ও উহাদের প্রতিষেধ

আমাদের অনেক মারাত্মক ব্যাধি যেমন কলেরা, বসন্ত, টাই-ফয়েড, যক্ষ্মা ইত্যাদি জীবাণু কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকে। আবার কতকগুলি মারাত্মক ব্যাধি সাধারণতঃ পশুদেহ হইতে (জীবাণু কর্ত্তৃক পশুদেহে এই রোগ উৎপন্ন হয়) মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়—যেমন বিড়াল হইতে ডিপ্থেরিয়া, ইঁদুর হইতে প্লেগ, কুকুর বা শৃগালের কামড় হইতে জলাতঙ্ক রোগ ইত্যাদি। এই সকল অতি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য জীবাণু জলে, বাতাসে, মাটিতে, খাদ্যে প্রায় সকল স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারা আমাদের প্রশ্বাস বায়ু, খাদ্য, পানীয় অথবা ক্ষতস্থান দিয়া দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। অনেক সময় কীটপতঙ্গ কর্ত্তৃক এক মানবদেহ হইতে অন্য মানবদেহে রোগ জীবাণু সংক্রামিত হয় যেমন মশা ম্যালেরিয়া জীবাণু বহন কারক। জীবাণু দেহে প্রবেশ করিলেই আমরা অসুস্থ হইয়া পড়ি না। যখন বহুসংখ্যক জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে অথবা দেহের দুর্ব্বলতাবশতঃ রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে তখন আমাদের অসুস্থ হইয়া পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। আমরা এইবার কয়েকটি ব্যাধি ও উহার প্রতিষেধ বিষয়ে আলোচনা করিব।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া বড় সাংঘাতিক ব্যাধি। ইহার আক্রমণে বাংলা-দেশের লোকের জীবনীশক্তি অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বহু লোক এই রোগে প্রতি বৎসর মরিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে।

[বহুকাল হইতে ডাক্তারদের ধারণা ছিল যে দূষিত বায়ু সেবন করিলে ম্যালেরিয়া রোগ হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ডাক্তার **ল্যাভারেন** ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তের লোহিতকণিকার মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। কিন্তু কি উপায়ে ঐ জীবাণু রুগ্ন ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ইহার পর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ডাক্তার **রোনাল্ড রস** ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ মশকীর পেটের ভিতর ম্যালেরিয়া জীবাণু আবিষ্কার করিলেন। তিনি প্রমাণ করিলেন, এনোফিলিস মশকী (এনোফিলিস মশক নহে) ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দেহ হইতে জীবাণু বহন করিয়া সুস্থ ব্যক্তির দেহে লইয়া যায় এবং এইভাবে ক্রমশঃ ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার ঘটে। তোমরা জানিয়া রাখ, এনোফিলিস্ মশকীর দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রথমে থাকে না। এই মশকী কোন ম্যালেরিয়া রোগীকে দংশন করিলে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু রোগীর দেহ হইতে মশকীর দেহে প্রবেশ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার ফলে মশকীর ম্যালেরিয়া ব্যাধি ধরে না। রোগ জীবাণু তাহার শরীরে সংখ্যায় বেশ বৃদ্ধি পায় ও সে যখন অন্য কোন মানুষকে দংশন করে তখন তাহার দেহস্থ জীবাণু সেই মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়। তাহলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ম্যালেরিয়া রোগী ও এনোফিলিস্ মশকী একসঙ্গে বর্ত্তমান না থাকিলে ম্যালেরিয়া রোগের সংক্রমণ হইতে পারে না। কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণু জল, বায়ু, মাটি, ধূলাবালি ইত্যাদির আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে কিন্তু ম্যালেরিয়ার জীবাণু অন্য জীবদেহ আশ্রয় না করিয়া বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্যই এদের **পরজীবী জীবাণু** বলে।]
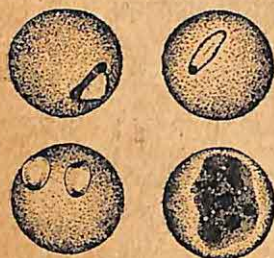
৭০ নং চিত্র—রক্তের লোহিতকণিকায় ম্যালেরিয়া রোগের একপ্রকার জীবাণু

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ :—ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হইবে :—

১। **মশক দংশন হইতে রক্ষার ব্যবস্থা**—এনোফিলিস্ মশকী ম্যালেরিয়া জীবাণুর বাহন। অতএব এর কামড়ান বন্ধ করিতে হইবে। ইহারা সূর্য্যকিরণ ও উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না বলিয়া প্রায়ই দিনের বেলায় বাহির হয় না ; রাত্রিকালে নিঃশব্দে উড়িয়া বেড়ায় [কিউলেক্স মশা শব্দ করিয়া দিনরাত উড়িয়া বেড়ায় এবং ইহারা ফাইলেরিয়া, কৃমি বা গোদের জীবাণু বহন করে]। সুতরাং সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যাহাতে মশা দংশন করিতে না

পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সূর্য্যাস্তের পর সমস্ত দেহ আবৃত রাখিলে ও রাত্রিতে মশারির মধ্যে শয়ন করিলে ইহাদের দংশন হইতে অনেকটা পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে ধূনা, গন্ধক ইত্যাদি জ্বালাইয়া ধোঁয়া দিলে মশা ধোঁয়া সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া যায়। রাত্রে লেবুর তৈল, তার্পিন তৈল বা ডি-ডি-টি মলম মুখে, হাতে ও পায়ে প্রভৃতি শরীরের অনাবৃত অংশে লাগাইলে মশা কামড়ায় না।

২। **মশককুলের বিনাশসাধন**—আবেষ্টনীর পরিচ্ছন্নতার উপর মশককুলের বিনাশসাধন নির্ভর করে। বনজঙ্গল, ঝোপ, আগাছা প্রভৃতি কাটিয়া বাড়ীর চারিপাশ পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। ডোবা, গর্ত্ত ইত্যাদি বুজাইয়া ফেলিতে হইবে, কারণ বদ্ধ জলে মশা ডিম পাড়ে। এমন কি ভাঙ্গা হাঁড়ি, কলসী, বোতলে যে জল জমে তাহাতেও মশা ডিম পাড়ে। অতএব ঐ সকল স্থানেও যাহাতে ডিম না পাড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। বড় বড় পুকুর বা জলাশয়ে কেরোসিন তৈল, প্যারিস গ্রীন বা ডি-ডি-টি মিশ্রিত তৈল ছড়াইয়া দিতে হইবে। ইহাতে জলের উপর একটি পাতলা সর পড়িবে এবং উহা ভেদ করিয়া মশার বাচ্চারা শ্বাস-কার্য্যের জন্য বাতাস লইতে পারে না। যে সব জলাশয়ের জল লোকে ব্যবহার করে তাহাতে তেচোকো, কই, পোনা ইত্যাদি মাছ ছাড়িতে হয়; ইহারা মশার বাচ্চা খাইয়া ফেলিবে।

৩। **জনস্বাস্থ্যের উন্নতি**—উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম ও মুক্ত বায়ুসেবন করিয়া সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করা দরকার এবং ম্যালেরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হইলে কুইনাইন, প্যালুড্রিন প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিয়া সত্বর রোগ নিবারণ করিতে হয়।

কলেরা

কলেরা ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি। 'কমা ব্যাসিলাস্' নামক এক

জাতীয় জীবাণু দ্বারা এই রোগ উৎপন্ন হয়। কলেরা রোগীর মল ও বমির সহিত এই জীবাণু অসংখ্য পরিমাণে নির্গত হয়। পরে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা ও অসাবধানতার জন্য ঐ সমস্ত জীবাণু খাদ্য ও পানীয়ের সহিত সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে ও কলেরা রোগ উৎপাদন করে। জল ও মাছির দ্বারা এই রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই রোগে চাউল ধোয়া জলের মত দাস্ত ও বমি হয় এবং প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

কলেরার প্রতিষেধ :—খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিলে আমরা এই রোগের বিস্তার বন্ধ করিতে পারি। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, লাইজল লোশন কমা জীবাণু নাশক। কলেরা রোগীর বমন ও মল লাইজল লোশনে মিশাইয়া পুঁতিয়া বা পোড়াইয়া ফেলিলে এই রোগের বিস্তার ঘটে না। আমাদের ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কলেরা রোগীর মল, বমন ও মলবমনযুক্ত বস্ত্রাদিতে মাছি, পিঁপড়া আরসুলা প্রভৃতি প্রাণী না বসিতে পারে কারণ এই প্রাণীগুলি আমাদের খাদ্য দূষিত করিয়া এই রোগ সংক্রামিত করিতে পারে। কলেরা রোগ আরোগ্য হইয়া গেলেও রোগীর মলে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত এবং কাহারও কাহারও মলে ৩।৪ সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই জীবাণু বিদ্যমান থাকে। সুতরাং রোগীর মল সম্বন্ধে উপরোক্ত সাবধানতা কিছুদিনের জন্য অবলম্বন করিতে হইবে।
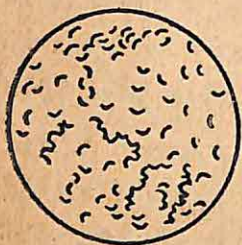
৭১নং চিত্র—কলেরার জীবাণু

২। শুশ্রূষাকারী ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি যাহাতে কলেরা রোগীর সংস্পর্শে না আসে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শুশ্রূষাকারী খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে লাইজল লোশন ও সাবান দ্বারা উত্তমরূপে হস্তাদি ধৌত করিয়া লইবে।

৩। কলেরা রোগীর মলবমনযুক্ত বস্ত্রাদি হয় পোড়াইয়া ফেলিবে অথবা লাইজল লোশনে ভিজাইয়া পরে সোডায় সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া লইবে।

৪। খাবার জিনিস সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে এবং জল, দুধ ভালরূপে না ফুটাইয়া পান করিবে না। কলেরার সময় খালি পেটে থাকিবে না এবং প্রত্যহ অম্লরস খাইবে কারণ অম্লরস কলেরা জীবাণুনাশক।

৫। কলেরার প্রতিষেধক টিকা লইলে এই রোগের হাত হইতে ৩।৪ মাসের জন্য রক্ষা পাওয়া যায়। নিকটে কোথাও কলেরা হইলে টিকা লইতে বিলম্ব করিবে না।

বসন্ত

বসন্ত একটি ছোঁয়াচে ও মারাত্মক রোগ। এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিলেও চিরদিনের মত মুখে ও শরীরে দাগ থাকিয়া যায়। বসন্ত রোগের সূক্ষ্ম জীবাণু ভাইরস (virus) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দৃষ্ট হয় না। ইহাদের অস্তিত্ব ফটোগ্রাফ্ প্লেটে ধরা পড়ে যখন বার্ণাডের অতি-বেগুনি আলোক সম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণেও ইহারা দৃষ্ট। রোগীর ক্ষতের পুঁজ ও সর্দ্দি-কাশিতে বসন্তের জীবাণু থাকে। সাধারণতঃ বায়ু, মাছি সংস্পর্শ দ্বারা এই রোগের বিস্তৃতি হয়।
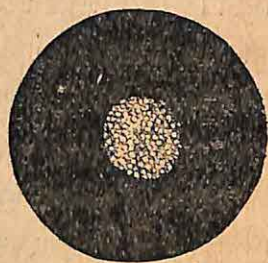
৭২নং চিত্র—বসন্তের ভাইরস

বসন্তের প্রতিষেধ :—বসন্ত রোগীকে এবং যাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাদিগকে পৃথকভাবে থাকিতে হইবে। রোগীর মলমূত্র, কফ্ ইত্যাদি ফর্ম্মালিন লোশনস্থিত পাত্রে রাখিয়া

দিবে, পরে উহা পোড়াইয়া ফেলিবে অথবা জলাশয় হইতে দূরে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবে। বসন্ত রোগীর মলমূত্র, কাপড়চোপড় যাহাতে জলাশয়ের জল দূষিত না করে তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ; নচেৎ এই রোগ সংক্রামক আকারে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে। বসন্ত রোগীর ঘরে কোন বিশোধক দ্রব্য যেমন ফর্ম্মালিন লোশন রাখা ভাল। মাছি দ্বারা যাহাতে রোগের বিস্তার না হইতে পারে সেজন্য রোগীকে সর্ব্বদা মশারির মধ্যে রাখিবে। বসন্ত রোগীর গুটি শুকাইয়া যে মাম্‌ড়ি পড়ে তাহা পোড়াইয়া ফেলিবে অথবা তীব্র বিশোধক দ্রব্যে রাখিয়া দিবে। আরোগ্য লাভ করিবার পরে কিছুদিন পর্য্যন্ত রোগীর দেহে বসন্তের জীবাণু বিদ্যমান থাকে। সুতরাং উপরোক্ত সাবধানতা কিছুদিন পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে হইবে।

২। শুশ্রূষাকারীরা সর্ব্বাঙ্গ কাপড় জামা দ্বারা আবৃত রাখিবে। রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিবার সময় ঐ কাপড় জামা ছাড়িয়া আসিবে। তাহারা আহার করিবার পূর্ব্বে হস্তাদি ভাল করিয়া ফর্ম্মালিন লোশনে ধুইয়া ফেলিবে।

৩। বসন্ত রোগী মারা গেলে ফর্ম্মালিন লোশনে চাদর ভিজাইয়া উক্ত চাদরে মৃতদেহ জড়াইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। রোগীর ব্যবহৃত বিছানা, বস্ত্রাদি পোড়াইয়া ফেলা ভাল ; ব্যবহার করিতে হইলে ফর্ম্মালিন লোশনে উত্তমরূপে শোধন করিয়া তবে ব্যবহার করা উচিত।

৪। টিকা লওয়াই বসন্ত রোগ নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায়। সকলেরই প্রতি বৎসর অথবা ২।১ বৎসর অন্তর টিকা লওয়া উচিত। আমাদের দেশে এই রোগে প্রতি বৎসর এখনও অনেক লোক মারা যায়, তাহার কারণ টিকা লওয়া সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞতা ও অনিচ্ছা।

খোস, পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি

খোস, পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই সকল চর্ম্মরোগ হইতে রক্ষা পাইবার প্রধান উপায় পরিচ্ছন্ন থাকা। চর্ম্ম রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত মেলামেশা করিলে, তাহাদের জামা, কাপড়, গামছা প্রভৃতি ব্যবহার করিলে, তাহাদের সহিত একত্রে শয়ন করিলে এই রোগ সংক্রামিত হয়। সুতরাং উপরোক্ত কার্য্যগুলি না করিলেই এই রোগের বিস্তার নিবারণ করা যায়।

খোস, পাঁচড়া ইত্যাদি হইলে ক্ষতস্থানগুলি প্রত্যহ ঈষদুষ্ণ জলে ও কার্ব্বলিক সাবানে ভাল করিয়া ধুইবে এবং গন্ধক মিশ্রিত কোন তৈল বা মলম কয়েকদিন ব্যবহার করিবে। তাহা হইলেই এই রোগ সারিয়া যায়। রোগীর কাপড়চোপড়, গামছা, চাদর ইত্যাদি পুনরায় ব্যবহারের পূর্ব্বে উত্তমরূপে গরমজলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

অনুশীলন

১। ম্যালেরিয়া রোগের কারণ কি? কি উপায়ে এই রোগের সংক্রমণ বন্ধ করা যায়।

২। কলেরা রোগের কারণ কি? কি উপায়ে ইহার সংক্রমণ বন্ধ করা যায়।

৩। বসন্ত রোগের কারণ কি? কি উপায় অবলম্বন করিলে এই মারাত্মক ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক প্রতিবিধান

মানুষের জীবনে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা হওয়া অসম্ভব নহে। সেইরূপ অবস্থায় রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ হইতে হয়তো বিলম্ব হইতে পারে কারণ সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার পাওয়া নাও যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে আমরা রোগীর রোগমুক্তির সহায়তা করিতে পারি। কাহারও কোন স্থান কাটিয়া গেলে, সর্প, বিছা ইত্যাদি দংশন করিলে ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে রোগীর অবস্থা কঠিনতর না হইয়া দাঁড়ায় এবং সেটা করা কখনই সম্ভব হয় না যদি না আমাদের প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে। আমরা এইবার কতকগুলি দুর্ঘটনায় প্রাথমিক সাহায্য কি ভাবে করা দরকার তাহা আলোচনা করিব।

আর্দ্র দাহ ও শুষ্ক দাহ—ফুটন্ত জল, গরম তৈল, ঘৃত ইত্যাদি দ্বারা দগ্ধ স্থানকে আর্দ্র দাহ বলে। আগুন, উত্তপ্ত লৌহ, তীব্র অ্যাসিড বা ক্ষার ইত্যাদি দ্বারা দগ্ধ স্থানকে শুষ্ক দাহ বলে। এই উভয় প্রকার দাহের ফলে চর্ম্ম কেবলমাত্র লালবর্ণ হইতে পারে, ফোস্কাও পড়িতে পারে। দেহের গভীর তন্তুগুলি পুড়িয়া কৃষ্ণবর্ণের ন্যায় হইতে পারে। সবচেয়ে ভয়ের কারণ হয় যখন ক্ষত দূষিত হইয়া যায় অথবা স্নায়ুবিক ধাক্কা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য সামান্য দাহও অবহেলা করা উচিত নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রাথমিক সাহায্যের দিক হইতে দুইটি জিনিস মনে রাখিতে হইবে। দগ্ধস্থানে বাতাস লাগিবে না ও ফোস্কা গালিয়া দেওয়া হইবে না। আহত স্থান বিশুদ্ধ তূলা দ্বারা ঢাকিয়া ব্যাণ্ডেজ দিয়া হালকা করিয়া বাঁধিয়া ডাক্তারের পরামর্শ লইবে। যদি

কাছাকাছি ডাক্তার না পাওয়া যায় তবে বেকিং সোডার লোশন (এক পাইন্ট উষ্ণ জলে বড় চামচের এক চামচ বাইকার্ব্বনেট অফ সোডা দিলে এই লোশন হয়) দিয়া দগ্ধস্থান ভিজাইয়া রাখিবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ডাক্তার আসিয়া যথাযথ ব্যবস্থা করেন।

অনেক সময় জামা কাপড় আগুন ধরিয়া দেহ গুরুতররূপে পুড়িয়া যায়। এরূপস্থলে ডাক্তারের সাহায্য লওয়া সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। বস্ত্রাদিতে আগুন ধরিলে ছুটাছুটি করা কোনক্রমেই উচিত নহে। ইহাতে আগুন না নিবিয়া বরং বেশী পরিমাণে জ্বলিয়া উঠে। কোন ব্যক্তি নিকটে না থাকিলে যদি কাহারও কাপড়ে আগুন লাগে তবে সে মেঝেতে গড়াগড়ি দিবে ও নিকটে যাহা কিছু আচ্ছাদন পাইবে তাহা দিয়া অগ্নিময় স্থান চাপিয়া ধরিবে ও সাহায্যের জন্য চীৎকার করিবে। সাহায্যকারী ব্যক্তি যদি নিকটে থাকে তবে সে কাঁথা, কম্বল, লেপ, তোষক যাহা কিছু সামনে পাইবে তাহা দ্বারা রোগীর চারিদিকে জড়াইয়া জলন্ত কাপড়ের দিকটা উপর দিকে রাখিয়া মেঝেতে শোয়াইয়া দিবে। বায়ুর অভাবে অল্পক্ষণের মধ্যে আগুন নিবিয়া যাইবে। ডাক্তারকে শীঘ্র খবর দিবে এবং তিনি আসিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন।

অস্থিভঙ্গ ও স্প্রেন—পতনের ফলে যদি অস্থিভঙ্গ ও রক্তস্রাব দুইই হয় তবে প্রথমে রক্তস্রাবের প্রতিকার করিতে হইবে। পরিষ্কার বস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষতস্থান আবৃত করিবে। তারপর স্পিল্ণ্ট বা অন্য কিছুর সাহায্যে ভগ্ন অঙ্গ যথাসম্ভব দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ না করা পর্য্যন্ত রোগীকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। অবশ্য জীবনের আশঙ্কা থাকিলে এই নিয়ম না মানিলেও চলিবে। যদি নিম্ন প্রত্যঙ্গে অস্থিভঙ্গ হয় এবং তাহার ফলে সেই অবয়ব খর্ব্ব হইয়া যায় তাহা হইলে যতক্ষণ না তাহা পুনরায় স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য

প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত পা ধরিয়া সমানভাবে ধীরে ধীরে টানিবে। এইভাবে প্রত্যঙ্গ সোজা করিতে পারিলে উহা স্প্লিণ্ট দ্বারা তদবস্থায় দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ করিবে (যে কোন প্রকার দীর্ঘ ও ও শক্ত বস্তু যেমন যষ্টি, কাষ্ঠফলক প্রভৃতি স্প্লিণ্ট হিসাবে ব্যবহৃত করিতে পার)। যদি অস্থিখণ্ড চর্ম্মভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া থাকে তাহা হইলে এই উপায়ে প্রত্যঙ্গখানি সোজা করিতে চেষ্টা করিবে না। যদি হস্তের উপরিভাগের অস্থিভঙ্গ হয় তবে প্রকোষ্ঠটি প্রগণ্ডের সহিত সমকোণ করিয়া কব্জিটিকে একটি ছোট শ্লিং এর মধ্যে স্থাপিত করিবে (৭৩নং চিত্র দেখ)। তারপর প্রগণ্ডের সম্মুখে, পশ্চাতে ও বহির্ভাগে স্কন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত বিস্তৃত তিনটি স্প্লিণ্ট স্থাপন করিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। যদি প্রকোষ্ঠের অস্থি (একখানি বা দুইখানি) ভগ্ন হয়, তবে করতল বক্ষাভিমুখী রাখিয়া প্রকোষ্ঠটিকে প্রগণ্ডের সহিত সমকোণ ভাবে স্থাপন করিবে। তারপর দুইটি কনুই হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্প্লিণ্টের সাহায্যে উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ করিয়া একটি বড় শ্লিং এর মধ্যে বাহুখানি ঝুলাইয়া দিবে। যদি দুইটি প্রকোষ্ঠ জখম হইয়া থাকে তবে দুইখানি হস্তই উক্ত উপায়ে বাঁধিয়া দিবে এবং পরে হাসপাতাল অথবা ডাক্তারের নিকট রোগীকে লইয়া যাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইবে।

৭৩ নং চিত্র—প্রগণ্ডের অস্থিভঙ্গ

অস্থিবন্ধনীর উপর আঘাত বা সন্ধিস্থলের তরুণাস্থির উপর আঘাত বা উভয়তে আঘাত লাগিলে সন্ধিস্থল ফুলিয়া উঠে ও বেদনা অনুভূত হয়। ইহাকে স্প্রেন বলে। সন্ধিস্থান সঞ্চালন করিতে চেষ্টা করিলে বেদনা বৃদ্ধি পায়। প্রতিবিধানের দিক

হইতে এইগুলি অবশ্য করণীয় ঃ— (১) অঙ্গ সঞ্চালন বন্ধ করিতে হইবে ও সর্ব্বাপেক্ষা আরামপ্রদ স্থানে উহাকে সংরক্ষণ করিতে হইবে; (২) সন্ধিস্থলে খুব শক্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া শীতল জলের পট্টি দিতে হইবে ও উহা সিক্ত রাখিতে হইবে; (৩) শীতল পট্টিতে রোগী যখন স্বস্তি বোধ করিবে না তখন ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দিয়া আবার পুনরায় উপরিউক্ত ক্রিয়াগুলি করিতে হইবে।

কাটিয়া যাওয়া ও রক্তস্রাব ঃ—আমাদের দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে রক্ত পড়িতে থাকে। অধিক রক্তপাত হওয়া বিপজ্জনক। সুতরাং প্রথমেই আমাদের রক্তপাত বন্ধ করিতে হইবে। পরে ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া কিছু টিংচার আইওডিন লাগাইয়া পরিষ্কার নেকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিবে। যদি রাস্তায় চলিতে চলিতে দুর্ঘটনা ঘটে এবং ক্ষতস্থানে ধূলা বালি লাগিয়া যায় তবে ডাক্তারের নিকট গিয়া একটি এন্টি-টেটানস্ ইন্‌জেকশন্ লইবে। কারণ ধূলাবালিতে 'টেটানস্ ব্যাসিলাস্' থাকে এবং ইহা মানবদেহে ধনুষ্টঙ্কার রোগ সৃষ্টি করে।

রক্ত বন্ধ করিবার সহজ উপায়গুলি তোমাদের জানিয়া রাখিতে হইবে। যদি ধমনী হইতে রক্তপাত হয় (এই রক্ত গাঢ় লাল হয় এবং প্রায়ই ফিন্‌কি দিয়া বাহির হয়) তবে ক্ষতস্থানের উপর দিকে অর্থাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে চাপ দিলে ঐ রক্তপাত বন্ধ হইয়া যায়। যদি শিরা হইতে রক্তপাত হয় (এই রক্ত একটু কাল্‌চে রঙের এবং সমভাবে একটানা স্রোতের মত বাহির হয়) তবে আহত স্থানের নীচের দিকে চাপ দিলে রক্তপাত বন্ধ হইয়া যায়। যদি কৈশিক নালী হইতে রক্তপাত হয় (এই রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং ক্ষতস্থানের সমস্ত জায়গা হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া সমভাবে রক্ত বাহির হয়) তবে ক্ষতস্থানের উপর চাপ দিলে এই রক্তপাত বন্ধ হয়। ধমনী, শিরা ইত্যাদিতে চাপ দিবার এক একটি বিশেষ স্থান আছে এবং

সেইখানে অল্পক্ষণের জন্য চাপ দিলেই রক্তপাত বন্ধ হইয়া যায়। খুব বেশীক্ষণ বা জোরে চাপ দেওয়া অনুচিত কারণ তাহাতে বিপদ বাড়িতে পারে। রক্তপাত যখন অত্যধিক পরিমাণে হইতে থাকে অর্থাৎ রক্তস্রাব হয় তখন প্রতিবিধানের দিক হইতে প্রথম কর্ত্তব্য তাগা বাধা। রক্তস্রাব যদি হস্ত বা পদ হইতে হয় তবে বাহুতে (প্রগণ্ডতে) বা উরুতে (জানুতে) তাগা বাঁধিবে। পায়ের উপর (জঙ্ঘায়) কিংবা অগ্রবাহুতে (প্রকোষ্ঠে) বন্ধনী দিবে না। ইহার কারণ একখানি অস্থির উপর (জানু ও প্রগণ্ডতে একখানি অস্থি আছে) যেরূপ সুষ্ঠ বাঁধন দেওয়া সম্ভব সেইরূপ দুইখানির উপর সম্ভব নয় (জঙ্ঘায় ও প্রকোষ্ঠতে দুইখানি করিয়া অস্থি থাকে)।

জলে ডোবা :—অনেকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিলে মানুষের সাধারণতঃ শ্বাসরোধের জন্য মৃত্যু হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, জলে ডোবা মানুষের জীবনের চিহ্ন না থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া আনয়ন করিয়া তাহাকে বাঁচান যায়। প্রথমে জলে ডোবা লোকটির মুখ হইতে জল, কাদা ইত্যাদি টানিয়া লইয়া তাহাকে উপুড় করিয়া মুখ একটু কাত ভাবে রাখিয়া (নাক ও মুখ ভূমি হইতে দূর থাকিবে), পা ছড়াইয়া ও বাহুদ্বয় মস্তকের দিকে প্রসারিত করিয়া শোয়াইবে। রোগীর পেটের নিম্নে কোন বালিশ বা প্যাড দিবার প্রয়োজন নাই। জিহ্বা টানিয়া বাহির করিবারও প্রয়োজন নাই কারণ উহা স্বতঃই ঠোঁটের দিকে ঝুলিয়া পড়িবে। তারপর একজন রোগীর বস্তিদেশের পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রোগীর শিরদাঁড়ায় দুই পার্শ্বে নিম্ন পঞ্জরাস্থিগুলির উপর হস্তদ্বয় রাখিবে (হস্তদ্বয় যেন রোগীর বস্তিদেশের উপর না আসে তাহা লক্ষ্য রাখিবে ; হস্তের কব্জিদ্বয় প্রায় পরস্পর স্পর্শ করিয়া থাকিবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকিবে—৭৪নং চিত্র দেখ)। তারপর সে তাহার দেহ অবনত করিয়া ধীরে ধীরে

সম্মুখের দিকে ঝুঁকিবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বাহুদ্বয় সোজা ও দৃঢ় থাকে এবং দেহের সমস্ত ভার হস্তের উপর ন্যস্ত হয় (৭৫নং চিত্র দেখ)। বেশী জোর করিবার প্রয়োজন নাই কারণ দেহের

৭৪নং চিত্র—কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া

ভার দ্বারাই প্রয়োজনীয় চাপ পড়িবে। এই চাপে রোগীর তলপেট মাটির সংস্পর্শে আসিয়া চাপ পাইবে এবং রোগীর উদরগহ্বরস্থিত যন্ত্রসকল মধ্যচ্ছদার উপর চাপ দিবে। ফলে মধ্যচ্ছদা উপরের দিকে উঠিবে। এই প্রক্রিয়ায় ফুস্‌ফুসের মধ্যে

৭৫ নং চিত্র—কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া

বায়ু বহিষ্কৃত হয় এবং বায়ুনালী ও মুখগহ্বরে যে জল বা শ্লেষ্মা থাকে তাহা নিঃসারিত হয় ও প্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইহার পর অবনত দেহ প্রথম অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এইভাবে মিনিটে ১২ বার এই ক্রিয়া করিয়া যাইতে হইবে' যতক্ষণ পর্য্যন্ত না স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া আরম্ভ হয়। ১৫ মিনিট হইতে ৩০ মিনিটের মধ্যে রোগী বাঁচিয়া থাকিলে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া আরম্ভ হইতে দেখা যায়। কিন্তু অনেক সময় দেখা গিয়াছে ২ ঘণ্টার পরে রোগীর স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া আরম্ভ

হইয়াছে। সুতরাং অর্দ্ধ ঘণ্টার পর হতাশ হইয়া কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া আনয়নের চেষ্টা যেন ছাড়িয়া দেওয়া না হয়; ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত এই ক্রিয়া চালাইয়া যাওয়াই ভাল। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস লওয়াইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকে রোগীর দেহ গরম করিবার জন্য হাতের তলা, পায়ের তলা, বগল প্রভৃতি স্থানে সেঁক দিবে। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে এবং যদি আবার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় তবে তৎক্ষণাৎ পুনরায় কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিবে।

বিছা, বোলতা, মৌমাছি, ভীমরুল প্রভৃতির দংশন :—এই সমস্ত কীটপতঙ্গের দংশনে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং শিশুদের পক্ষে সময় সময় ইহা প্রাণনাশক হইতে পারে। প্রথম কার্য্য হইল হুল তুলিয়া ফেলা। দষ্টস্থানে একটা চাবির ছিদ্রদিকটা চাপিয়া ধরিলে হুল উঠিয়া আসিবে। তারপর লিকার এ্যামোনিয়া অথবা টিংচার আইওডিন লাগাইলে জ্বালার উপশম হয়। যদি যন্ত্রণা খুব বেশী হয় ডাক্তারকে খবর দিবে।

সর্পদংশন :—সর্পদংশনে ভয়ের কারণ খুব বেশী। কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ মারা যাইতে পারে। তবে কতকগুলি সাপের বিষ নাই এবং তাহাদের দংশনে কোন ক্ষতি হয় না। সবিষ সর্প যদি কামড়ায় তবে বিষদাঁত ও অন্যান্য দাঁতের দাগ থাকে। বিষদাঁতের দাগ দুইটি অপেক্ষাকৃত মোটা। যদি কেবল ছোবল মারে তবে কেবল বিষদাঁতের দাগ থাকে, অন্যান্য দাঁতের দাগ থাকে না। নির্ব্বিষ সাপ কামড়াইলে কয়েকটি ছোট ছোট দাগ হয়। মোটা দাগ দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি সর্পটি বিষধর কিনা। যাহা হউক, সর্প নির্ব্বিষ কি সবিষ বুঝিতে না পারিলে উহাকে বিষাক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত এবং তৎক্ষণাৎ

ডাক্তারকে খবর দিতে হইবে। সাপে কামড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে দষ্ট স্থানের উপর দিকে (হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে) দুই তিনটি তাগা কাপড় ছিঁড়িয়া বা রুমাল দিয়া বেশ টানিয়া বাধিয়া দিবে। ইহার কারণ শিরার মধ্য দিয়া কিছুক্ষণের জন্য রক্ত চলাচল বন্ধ করিতে হইবে। তাগা উরুতে (জানুতে) অথবা বাহুতে
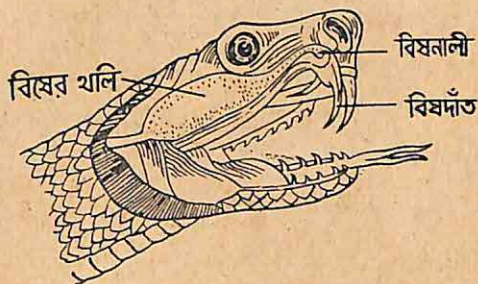
৬নং চিত্র—সর্পের বিষদাঁত, বিষনালী ও বিষের থলি

(প্রগণ্ডতে) বাধিবে, পায়ের উপর (জঙ্ঘায়) কিংবা অগ্রবাহুতে (প্রকোষ্ঠে) বন্ধনী না দেওয়াই ভাল। ইহার কারণ একখানি অস্থির উপর (জানু ও প্রগণ্ডে একখানি করিয়া অস্থি আছে) যেরূপ সুষ্ঠ বাধন দেওয়া সম্ভব সেইরূপ দুইখানি অস্থির উপর সম্ভব নয় (জঙ্ঘায় ও প্রকোষ্ঠতে দুইখানি করিয়া অস্থি থাকে)। চাপিয়া বাধি[illegible] সঙ্গে ক্ষতস্থান পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গা- নেটএর জল ধ[illegible]য়া ফেলিবে। তারপর দংশিত স্থানটির সন্নিকটে তীক্ষ্ণধার ছুরি বা খুরের সাহায্যে প্রায় ¼ ইঞ্চি গভীর করিয়া চিরিয়া বিষের শক্তি নষ্ট করিবার জন্য পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের গুঁড়া ঘষিয়া দাও। ক্ষতস্থানের উপর টানিয়া বাঁধা আছে বলিয়া বেশী রক্তপাতের আশঙ্কা নাই। তারপর ডাক্তার আসিয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন। অবশ্য ১৫।২০ মিনিট অন্তর একবার করিয়া বন্ধন ১ মিনিটের জন্য অথবা যতক্ষণ না

গাত্রচর্ম্মে লাল আভা দেখা দেয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত **একটু আল্‌গা** করিয়া দিয়া আবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। ইহার কারণ ধমনীর মধ্য দিয়া ২০।২৫ মিনিটের অধিক রক্ত সঞ্চালন বন্ধ রাখিলে (arterial circulation) গ্যাংগ্রীন্ (gangrene) হওয়ার ভয় থাকে। বন্ধন একটু আল্‌গা করার দরুণ ধমনীর মধ্য দিয়া রক্ত সঞ্চালন সম্ভব (কারণ ধমনীর গাত্রপ্রাচীর মোটা) কিন্তু শিরার গাত্রপ্রাচীর পাতলা থাকায় উহার ভিতর দিয়া রক্ত সঞ্চালন একরূপ বন্ধ থাকিবে এবং ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে বিষযুক্ত রক্ত যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত রোগীকে ঘুমাইতে দিবে না। গরম চা, কফি, দুগ্ধ খাইতে দাও। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে বিষ সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইবার পরও ডাক্তার 'এন্টিভেনিন-সিরাম' ইন্‌জেকশন দিয়া রোগীকে আরাম করিয়াছেন।

ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুকুরের দংশন :—শৃগাল, কুকুর, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি জন্তুদের একপ্রকার মারাত্মক রোগ হয়, তাহার নাম জলাতঙ্ক রোগ। এই রোগ হইলে তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কিন্তু শৃগাল, কুকুর দশ দিনের বেশী বাঁচে না। উহাদের চোখ লাল হয়, মুখ দিয়া অনবরত লালা পড়ে, জল বা খাদ্য কিছুই গিলিতে পারে না। মানুষ দেখিলেই কামড়াইতে আসে। এই রোগ অতি সূক্ষ্ম একপ্রকার জীবাণু 'রেবিজ ভাইরস' (এই জীবাণু ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে দৃষ্ট) দ্বারা উক্ত জন্তুদের দেহে সংঘটিত হয়। এই রোগে আক্রান্ত জন্তুদের লালায় এই বিষ থাকে এবং জন্তুটি যদি কোন মানুষকে কামড়ায় বা আঁচড়ায় বা কোন ক্ষতস্থান চাটে তবে মানুষের ঐ রোগ হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক **পাস্তুর** এই সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং রোগ উপশম করিবার উপায়ও বাহির করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সব দেশেই আজকাল

পাস্তুর-প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কলিকাতায় স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে এর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

কোন কুকুর কামড়াইলে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে সেই কুকুরটি জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত কিনা। দশদিন কুকুরটির উপর লক্ষ্য রাখিলেই আমরা এইটা বুঝিতে পারিব, কারণ জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত কুকুর দশদিনের বেশী বাঁচে না। এইরূপ কুকুর কামড়াইলে সর্ব্বপ্রথম ডাক্তারকে খবর দিবে এবং ক্ষতস্থানের যথারীতি চিকিৎসা করিতে হইবে। ক্ষতস্থানটি সাবান ও জল দিয়া ধুইয়া ফেলিয়া একটি দেশলাইয়ের কাঠি তীব্র কার্ব্বলিক অ্যাসিডে ডুবাইয়া ক্ষতস্থান ও উহার চারিপার্শ্বে বুলাইয়া দাও। তারপর রোগীকে চিকিৎসার জন্য স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে পাঠাইয়া দিবে।

অনুশীলন

১। প্রাথমিক প্রতিবিধান বলিতে কি বুঝ? পতনের ফলে হাতের অস্থি ভঙ্গ হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে?

২। ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুকুরের দ্বারা দংশিত ব্যক্তির প্রাথমিক প্রতিবিধানের দিক দিয়া কি কি করা প্রয়োজন?

৩। সর্প দ্বারা দংশিত ব্যক্তির প্রাথমিক প্রতিবিধানের দিক দিয়া কি কি করা প্রয়োজন?

৪। জলে ডোবা মানুষের প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা কর।